শ্রদ্ধেয় অটলজী :
কিছু স্মৃতি
কিছু কথা
— পৃঃ ১৭

# স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

অতীতের সব
রেকর্ড ভেঙে
ফিরে আসবে
এন ডি এ
—পৃঃ ১৩

৭০ বর্ষ, ৫৩ সংখ্যা।। ২৭ আগস্ট ২০১৮।। ১০ ভাদ্র - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

## এবার বিজেপি কি একাই তিনশো ?

# স্বস্তিকা

*।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।*

৭০ বর্ষ ৫৩ সংখ্যা, ১০ ভাদ্র, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

২৭ আগস্ট - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

**সম্পাদক : বিজয় আঢ্য**

**সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল**

**প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**

**সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪**

**অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১**

**অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬**

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

**দাম : ১০ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।**

**Postal Registration No.**- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।


# সূচীপত্র


**সম্পাদকীয় ▯ ৫**

**শোক প্রকাশের আড়ালে রাজনীতির সলতে পাকিয়েছেন মমতা ▯** গূঢ়পুরুষ ▯ ৬

**ভাবনা-চিন্তা : ভারতে রাজাকারদের ঠাঁই হতে পারে না ▯** শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৭

**খারাপের সঙ্গে ভালোকেও তাকিয়ে দেখতে হবে ▯** অমিশ ▯ ৮

**এন আর সি-র স্ক্যানারে বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের নীল নকশা ▯** সাধন কুমার পাল ▯ ১১

**সাক্ষাৎকার : অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে ফিরে আসবে এন ডি এ : নরেন্দ্র মোদী ▯** ১৩

**২০১৯-এ গরিষ্ঠাংশ দেশবাসীর পছন্দের তালিকায় নরেন্দ্র মোদী ▯** ড. জিষ্ণু বসু ▯ ১৫

**শ্রদ্ধেয় অটলজী : কিছু স্মৃতি, কিছু কথা ▯** বিজয় আঢ্য ▯ ১৭

**সমীক্ষা বলছে উনিশে আবার মোদী ▯** অভিক সরকার ▯ ২৩

**বিজেপির একজন মোদী আছেন ▯** রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ২৪

**মমতার ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বনাম বিজেপির রাষ্ট্রধর্ম ▯** চন্দ্রভানু ঘোষাল ▯ ২৬

**আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য ▯** সজল আচার্য ▯ ৩১

**ঐতিহ্যমণ্ডিত ঝুলনযাত্রা ▯** সপ্তর্ষি ঘোষ ▯ ৩৩

**স্বাধীনতা সংগ্রাম ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ▯** সুব্রত ভৌমিক ▯ ৩৫

**মার্কসবাদ অথবা বুর্জোয়া গবেষণাগারে বানানো সর্বহারার টনিক (তৃতীয় পর্ব) ▯** দেবাশিস লাহা ▯ ৪৩

**সংস্কৃত ভাষা দিবস এবং সংস্কৃত সপ্তাহ ▯** সমিত দে ▯ ৪৫

**নিয়মিত বিভাগ**

**উবাচ : ১০ ▯ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ অঙ্গনা : ২১ ▯**

**সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ এইসময়, সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০ ▯**

**নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯ ▯ চিত্রকথা : ৪০ ▯ খেলা : ৪১▯**

**স্মরণে : ৪৯ ▯ সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

প্রকাশিত হবে ৩ সেপ্টেম্বর, '১৮

# স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৩ সেপ্টেম্বর, '১৮

## আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

## স্মরণে মননে অটলবিহারী

কোনও কোনও মানুষ থাকেন যাঁদের সামনে নিয়ে দাঁড়ালে অস্থির মন অবলম্বন খুঁজে পায়। তাঁদের মনে থাকে না— এমনকী মনে রাখার দরকারও পড়ে না কার রাজনীতির কী রং। কিংবা কে কোন আদর্শে বিশ্বাসী। অটলবিহারী বাজপেয়ী ছিলেন এমনই মহীরূহ-সম ব্যক্তিত্বের মানুষ। সবাইকে আপন করে নিতে পারতেন। আর পারতেন বলেই তিনি এদেশের কোয়ালিশন রাজনীতির চাণক্য হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা প্রয়াত অটলবিহারী বাজপেয়ীর স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। লিখবেন এই সময়ের বিশিষ্ট লেখকরা।

।। দাম একই থাকছে— দশ টাকা মাত্র।।

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani


সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

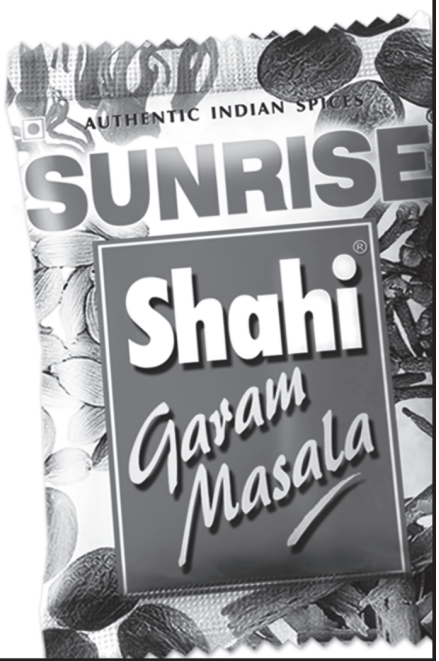


SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

*জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী*

# সম্পাদকীয়

## কেরলে বন্যা

সার্বিক ভাবে গত কয়েক দিনের তুলনায় কেরলের বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হইয়াছে। বৃষ্টি অনেকটাই কমিয়াছে। ধীর গতিতে হইলেও কিছু এলাকা হইতে জল নামিতেছে। কেরলের ১৪টি জেলা হইতে চূড়ান্ত সতর্কতা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। তবে অঞ্চলভিত্তিক ভারী বর্ষণ অব্যাহত। এখন প্রশাসনের কাছে বড়ো চ্যালেঞ্জ মহামারীর আশঙ্কা। বন্যার জল সরিয়া যাইলে নানাবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। ইহা ছাড়া রাজ্য সরকারের কাছে এখন সর্বাপেক্ষা বড়ো চ্যালেঞ্জ যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্স্থাপন। রাজ্যের প্রায় ১০ হাজার কিলোমিটার সড়ক হয় জলের নীচে না হয় জলের তোড়ে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। বন্যা আর ধসের জেরে ঘরছাড়া হইয়া ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় লইয়াছেন ৬ লক্ষের বেশি মানুষ। লক্ষণীয়, কেরলের এই ভয়াবহ বন্যায় প্রাণভয় উপেক্ষা করিয়া তিন বাহিনীর জওয়ানরা যেভাবে উদ্ধারকার্য চালাইতেছেন, তাহা সাহসিকতার এক অনন্য নজির। কেরলের চানাকুডিতে এক তিনতলা বাড়ির ছাদে লেফটেন্যান্ট কমান্ডার অভিজিৎ গরুড় হেলিকপ্টারের চাকা মাত্র ছুঁয়াইয়া (লাইট অন হুইলস্) ২৬ জনকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিলেন কিংবা মৎস্য ব্যবসায়ী কে পি জয়সল নিজের পিঠকে পাটাতন হিসাবে ব্যবহার করিয়া মহিলাদের নৌকায় উঠিতে যেভাবে সাহায্য করিলেন তাহা শুধু প্রশংসায় ব্যক্ত করা যায় না। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরাও যেভাবে সেনাবাহিনীর পাশাপাশি উদ্ধারকার্য ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে তাহাও যথেষ্ট প্রশংসার যোগ্য। আশার কথা, সারাদেশ তো বটেই, বন্যা-বিপর্যস্ত কেরলের পাশে দাঁড়াইয়াছে গোটা বিশ্ব। শুধু সংযুক্ত আরব আমিরশাহির শিল্পপতিরাই ১৩ কোটি টাকার সাহায্য ঘোষণা করিয়াছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহের পর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোদীও বন্যাপীড়িত এলাকা পরিদর্শন করিয়া অন্তবর্তীকালীন ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত বন্যায় মৃত ও আহত ব্যক্তিদের জন্যও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। কেরলের এই বন্যাকে প্রায় জাতীয় বিপর্যয়ের মতো গণ্য করা হইতেছে। কেন্দ্র সরকারের পাশাপাশি অন্য রাজ্য সরকারগুলিও কেরলের এই বিপর্যয়ে অর্থ ও ত্রাণসামগ্রী দিয়া সাহায্যের হাত প্রসারিত করিবেন—ইহাই সময়ের দাবি। কেরলে এইরকম ভয়াবহ বন্যা প্রায় একশত বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। কিন্তু পরিবেশবিদ ও জল-জঙ্গল- জমি লইয়া যাঁহারা চিন্তা-ভাবনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা বারবার সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে, কেরল নিজের ভবিষ্যৎ লইয়া খেলা করিতেছে। দুর্ভাগ্য হইল, অন্য রাজ্যের মতো কেরলেও এই সতর্ক বার্তা উপেক্ষা করা হইয়াছে। পাঁচ বৎসর পূর্বে উত্তরাখণ্ডের বন্যা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে। কেরলের শাসক গোষ্ঠী ও আমলাতন্ত্রকে তাই জবাবদিহি করিতে হইবে যে, পর্যাবরণ সংক্রান্ত সতর্কীকরণের রিপোর্টকে তাহারা কেন সেলফে তুলিয়া রাখিয়াছিল? কেন সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে খনন ও নির্মাণকার্য বন্ধ করিতে উদ্যোগী হয় নাই? এই বন্যাকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় স্বীকার করিয়াও বলা যায় কেরলের সরকার ও প্রশাসন ইহার জন্য কম দায়ী নয়। আরও আশংকার বিষয় হইল, আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও পরিবেশ রক্ষার্থে অবৈধ নির্মাণ ও খনন কাজ বন্ধ করিতে তেমন কোনও উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাইতেছে না। বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে কেরলের মতো আবার এইরূপ দুষ্পরিণাম ভোগ করিতে হইবে।

## সুভাষিতম্

*ন গৃহাণি ন বাসাংসি ন প্রাকারাশ্চ রক্ষকাঃ।*

*ন বন্ধুর্বান্ধবা নৈব সুশীলো হি কুলপ্রিয়ঃ।। (চাণক্য নীতি)*

*গৃহ, বস্ত্র, প্রাচীর, প্রহরী, বন্ধু-বান্ধব—কেউই প্রিয় নয়। একমাত্র চরিত্রবান ব্যক্তিই বংশের সকলের কাছে প্রিয়পাত্র হয়ে থাকে।*

# শোকপ্রকাশের আড়ালে রাজনীতির সলতে পাকিয়েছেন মমতা

কলকাতার প্রায় সব বাংলা খবরের কাগজের নির্লজ্জ মমতা বন্দনা এখন সভ্যতা ভদ্রতার সীমারেখা পার করে গেছে। সদ্য প্রয়াত অটলবিহারি বাজপেয়ীর মরদেহের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তৃণমূল নেত্রী দিল্লি যান। কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল ফেডারেল ফ্রন্ট গড়ার জন্য সলতে পাকানো। তিনি সারাদিন বিরোধী নেতা নেত্রীদের সঙ্গে গোপন বৈঠকে কাটিয়ে ছিলেন কলকাতার বাংলা খবরের কাগজে তার কথা লেখা হয়নি। রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার চলাকালে প্রতিটি জনসভায় তৃণমূল নেত্রী আহ্বান জানিয়ে ছিলেন যে আনন্দবাজার পত্রিকা পড়বেন না। এবিপি আনন্দ টেলিভিশন নিউজ চ্যানেল বয়কট করুন। অথচ সেই তিনি একমাত্র আনন্দবাজার পত্রিকার জন্য কলম ধরেছিলেন বোঝাতে যে বাজপেয়ীজী তাঁর কতটা কাছের মানুষ ছিলেন। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তিনি সর্বপ্রথম মমতার মতামত নিতেন। নিজের দলের নেতাদের নয়। এটা নির্জলা মিথ্যা।

বাজপেয়ী মন্ত্রীসভায় মমতা ছিলেন রেলমন্ত্রী। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁকে অবহিত করাটা দেশের প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য ছিল। বাজপেয়ীজী সেই কর্তব্যটুকুই করেছিলেন। মমতা তাঁর অতি অপছন্দের আনন্দবাজার পত্রিকার জন্য যখন কলম ধরলেন তখন তিনি রেলমন্ত্রক থেকে পদত্যাগ করে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন কেন সেই গোপন কথাটি বাংলার মানুষকে অকপটে জানাতে পারতেন। তিনি যদি বাজপেয়ীজীর বিশেষ স্নেহধন্যই হবেন তবে তাঁর শত অনুরোধেও পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নেননি কেন? বিজেপি জোট ছেড়ে রাতারাতি তিনি কংগ্রেস জোটে ভিড়েছিলেন

**গূঢ়পুরুষের কলম**

কেন? বাংলার মানুষ তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার নেপথ্য ইতিহাস জানতে চায়। আর সেই নেপথ্য ইতিহাস মমতা নিজের হাতে লিখে রেখে গেলে দেশের নবীন প্রজন্ম উপকৃত হতো। সুবে বাংলার মসনদে বসার জন্য মিরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। দিদি বাজপেয়ীজীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন কোন মসনদের আশায় বড় জানতে ইচ্ছা করে।

কেরলের বন্যাদুর্গত মানুষের জন্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সেখানে আটকে পড়া বাঙালিদের উদ্ধার করে পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছেন প্রশাসনকে। আপত্তিটা এখানেই। শুধু বাঙালিরা কেন? কেরলের প্রতিটি বন্যাদুর্গতকে রক্ষা করাটাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিল না কি। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল থেকে ৫০০ কোটি টাকা জরুরি ভিত্তিতে দিয়েছেন। ভারতীয় রেল কয়েক কোটি বোতল বিশুদ্ধ পানীয় জল পাঠিয়েছে। পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত পানীয় জলের সরবরাহ চলবে। মহারাষ্ট্র সরকার ২০ কোটি টাকার ত্রাণ ঘোষণা করেছে। বিহার, গুজরাট, ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ দিয়েছে ১০ কোটি টাকা করে। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী টুইট করে দুর্গতদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। নানা মহলে সমালোচনা শুরু হওয়ার পর অবশেষে ১০ কোটি টাকা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। কেরলে প্রায় ১০ লক্ষ বাঙালি বাস করেন। এঁদের মধ্যে তিন লক্ষ বাঙালি বন্যাক্লিষ্ট এলাকায় আটকে পড়েছেন। মমতার সমবেদনায় তাঁরা কতটা উপকৃত হবেন আমার জানা নেই। সমবেদনার সঙ্গে কয়েক বস্তা চিঁড়ে পাঠালে বাঙালি বানভাসিরা উপকৃত হতেন।

কলকাতার সাংবাদিকদের মধ্যে এখন অলিখিত প্রতিযোগিতা চলছে যে কে কতটা দিদির কাছের লোক। একদা দিদির প্রিয়পাত্রী এবং চোখের মণি ছিলেন মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার ভারতী ঘোষ। এখন তিনি দিদির চোখের বালি। ভারতী ঘোষ জঙ্গলমহলে মাওবাদীদের নিকেশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়। মমতাকে 'মা' বলে সম্বোধন করতেন। এরপর কোন অজ্ঞাত কারণে তিনি মমতার বিষ নজরে পড়েন, চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন। প্রাণরক্ষার জন্য তিনি আত্মগোপন করেছেন। ভারতী ঘোষের স্বামীকে জেল হাজতে পুরে পেটানো চলছে। এ এক অদ্ভুত অবস্থা।

প্রয়াত বাজপেয়ীজীর মন্ত্রীসভা থেকে হঠাৎ মমতা পদত্যাগ করেছিলেন কেন তা দেশবাসীর জানা নেই। একটা বানানো মিথ্যা গল্পকে কারণ হিসেবে বলা হয়। মমতাপন্থী সাংবাদিকরা গলাবাজি করে প্রমাণ করতে চান যে বাজপেয়ী মন্ত্রীসভার দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মমতা পদত্যাগ করেছিলেন। মমতা নিজে কোনোদিন কারণটা বলেননি। তেমনি তাঁর দলের একদা দু' নম্বর নেতা মুকুল রায়, আই পি এস ভারতী ঘোষ দিদির বিষ নজরে পড়লেন কেন? কেউ জানে না। যে কথাটা রাজ্যবাসী জানেন তা হচ্ছে মমতা মানসিকভাবে রাজনৈতিক নিরাপত্তা- হীনতায় ভোগেন। তাই দলের কেউ জনপ্রিয় হচ্ছেন দেখলেই তাঁকে তাড়াতে দু'বার ভাবেন না।

### বিজ্ঞপ্তি

**স্বস্তিকা-র গত কয়েকটি সংখ্যায় স্বস্তিকার প্রতি কপির ও বার্ষিক গ্রাহক মূল্য বৃদ্ধির যে ঘোষণা করা হয়েছিল তা আপাতত স্থগিত রাখা হলো। পুনরায় বিজ্ঞপ্তি মারফত না জানানো পর্যন্ত স্বস্তিকার দাম ও গ্রাহকমূল্য একই থাকবে।**

**— সম্পাদক, স্বস্তিকা**

# ভারতে রাজাকারদের ঠাঁই হবে না

**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়**

পূর্বপাকিস্তানের রাজাকাররা দীর্ঘ দিন পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসের ফলে বাংলাভাষা খুব ভালভাবে জানেন, কিন্তু মনে প্রাণে তারা নিজেদের বাঙালি মনে করেন না। তারা ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন, পাকিস্তান যাতে না ভেঙে যায় সেই জন্য তারা ১৯৭০-১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় খান সেনাদের সহায়তায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ৩০ লক্ষ নিরীহ বাঙালিকে হত্যা এবং লক্ষ লক্ষ বাঙালি যুবতীকে ধর্ষণ করেছিল। ফলে ১৯৭১ সালে পাক-মুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে তারা সমস্ত বাংলাদেশিদের চোখে ঘৃণার পাত্র হয়, বাংলাদেশ তাদের পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেতে বলে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান এই সব অপরাধীদের গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। সেই সময় তারা ঠিক করে লং মার্চ করে ভারতের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানে ফিরে যাবে। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর আমলে তা সম্ভব হয় না। তখন থেকেই তারা বিভিন্নভাবে নানা চোরাগোপ্তা পথে ভারতে প্রবেশ করে এখানকার জনসাধারণের মধ্যে মিশে যেতে থাকে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে বামফ্রন্টের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল তা বুঝা যাবে প্রয়াত প্রখ্যাত সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্তের এক প্রখ্যাত খবরের কাগজে লেখা উত্তর সম্পাদকীয়তে— ১৯৭১ সালে বামফ্রন্টের নেতারা পার্কসার্কাসে বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ি ভবনে হুমকি দিতে গিয়েছিলেন, কেন তারা পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ গড়ার জন্য যুদ্ধ করছেন?

ইন্দিরা সরকার পতনের পরে দেশে টালমাটাল মিলিজুলি সরকার গঠন হয়, উপরোক্ত নেতারাও ওই সরকারের শরিক হন, সীমান্তের কড়াকড়িও অনেক কমে যায়, ব্যাপকভাবে বাংলাদেশে ব্রাত্য রাজাকারদের অনুপ্রবেশ ঘটে। ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ স্বাধীনতা- পরবর্তী সময়, টালমাটাল অবস্থা, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যাতায়াত ছিল অবাধ, পাশপোর্ট-ভিসার বালাই ছিল না, দাঙ্গার ভয়ে যারা ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই তাদের অনেকেই এদেশে ফিরে এসেছিলেন। ফলে ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সালে মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছিল ৩৮.৫৬ শতাংশ। এর পরবর্তী সময়ে অবস্থা স্বাভাবিক হবার জন্য ১৯৭১, ২০০১, ২০১১ সালের দশকগুলিতে মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছিল ২৯.৯৬ থেকে ১৯.৫৯ শতাংশ, ধরা যাক ৩০ শতাংশ। অসমে 'বিদেশি অনুপ্রবেশকারী হটাও' আন্দোলনের জন্য ১৯৮১ সালে জনগণনা সম্ভব হয়নি, কিন্তু ১৯৯১ সালে জনগণনায় দেখা গেল ২ দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ৭৭.৩৩ শতাংশ। দশকে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি ধরে দুই দশকে অসমের মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া উচিত ছিল ৬৯ শতাংশ, কিন্তু ওই সময় বৃদ্ধি হয়েছে ৭৭.৩৩ শতাংশ, অর্থাৎ ৮.৩৩ শতাংশ বেশি! এই হঠাৎ বাধ-ভাঙা জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলো বাংলাদেশে ব্রাত্য রাজাকারদের আগমনে।

এবার পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান জনসংখ্যার ব্যাপারে আসা যাক :

এখানেও সেই একই ব্যাপার, ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ স্বাধীনতা- পরবর্তী সময় দাঙ্গার ভয়ে যারা ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই তাদের অনেকেই ফিরে এসেছিলেন। ফলে ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সালে মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছিল ৪১.৮২ শতাংশ। এর পরবর্তী সময়ে স্বাভাবিক হবার জন্য ১৯৭১, ২০০১, ২০১১ সালের দশকগুলিতে মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছিল ২৯.৭৬ থেকে ২১.৮১ শতাংশ। কিন্তু ১৯৯১ সালে জনগণনায় দেখা গেল জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ৩৬.৬৭ শতাংশ। প্রকৃতপক্ষে এই দশকে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হওয়া উচিত ছিল ১৯৮১ এবং ২০০১ দশকের বৃদ্ধির গড়, অর্থাৎ (২৯.৫৫ + ২৬.১১)/২ = ২৭.৮৩ শতাংশ, কিন্তু বৃদ্ধি হয়েছে ৩৬.৬৭ শতাংশ, অর্থাৎ ৮.৮৪ শতাংশ বেশি (৩৬.৬৭ - ২৭.৮৩ = ৮.৮৪)। হঠাৎ এই বাধ-ভাঙা জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলো বাংলাদেশে ব্রাত্য রাজাকারদের অনুপ্রবেশ। সংখ্যায় তারা হলো ১১৭,৪৩,২০৯ গুণ ৮.৮৪ শতাংশ = ১০,৩৮,১০০ এবং তারা ১৯৯১ সালের মধ্যেই এসেছিল। ১৯৯১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ২ দশকে ৩০ শতাংশ হারে বড়ে ২০১১ সালে তাদের সংখ্যা হয়েছিল = ১৭, ৫৪,৩৮৮ এবং ২০১৮ সালে একই হারে (বছরে ২.৬৬ হারে) বৃদ্ধি পেয়ে তাদের সংখ্যা ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে = ২১, ০৮,৩১১ (একুশ লক্ষ)। অসম এবং পশ্চিমবঙ্গ মিলে রাজাকারদের সম্ভাব্য সংখ্যা = ২৭.১৬,০০০ (সাতাশ লক্ষ ষোল হাজার)!

অসমে এন আর সি হয়েছে, ৪০ লক্ষ লোকের নাম বাদ পড়েছে। এর মধ্যে নিশ্চয়ই ৬ লক্ষ রাজাকার আছে। খবরে প্রকাশ, এই বাতিলের মধ্যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদের আত্মীয়স্বজন আছেন, সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত বহু কর্মী আছেন, অসরকারি কর্মী আছেন যাদের নাগরিকত্বের ব্যাপারে সমস্ত প্রমাণ অবশ্যই আছে।

এগুলি হয়তো অনিচ্ছাকৃত ভুল অথবা রাজাকারদের সঙ্গে সাধারণ নাগরিকদের গুলিয়ে ফেলানোর অপচেষ্টা, যার সংশোধন হবেই কিন্তু বাংলাদেশের ধর্ম-নির্বিশেষে ৩০ লক্ষ বাঙালি হত্যাকারী রাজাকারদের বিতাড়ন করা দরকার এবং পরবর্তী ক্ষেপে দরকার পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং অন্যান্য রাজ্যে এন আর সি-র মাধ্যমে বাকি রাজাকারদের চিহ্নিত করা এবং বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া।

■

# খারাপের সঙ্গে ভালোকেও তাকিয়ে দেখতে হবে

অতিথি কলম

অমিশ

ভারতের প্রাচীন যুগের প্রাজ্ঞেরা একটা কথাই বলতেন— জীবনকে নিরীক্ষণ করতে গেলে, তার মুখোমুখি হতে গেলে সব সময় পরিপ্রেক্ষিত কথাটি গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। জীবনের গতিপথের মানদণ্ড হবে ধর্ম। এই ধর্মের প্রশ্নটি আরও গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, নানান সমস্যার মিলিত আঘাত আমাদের প্রায় নিমজ্জিত করে ফেলেছে।

ব্যক্তিগতভাবে বিগত বছরটি আমার নিজের পক্ষে ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। পর পর অনেকগুলি ব্যক্তিগত বিয়োগান্তক ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছে। আর এগুলি ঘটেছে একের পর এক। যেন পূর্বনির্ধারিত নির্ঘণ্ট বেঁধে। অনেকেই হয়তো ঠোঁট চেপে এর মোকাবিলার কথা বলবেন, কিন্তু ভেতরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও হতাশার আক্রমণ রোখা সহজ নয়। পৃথিবীর বৈষম্যমূলক আচরণে জন্ম নেয় অন্তর্লীন ঘৃণা। এমনকী পবিত্র ঈশ্বরের ওপর আক্রোশ ধূমায়িত হতে থাকে। আর আমি ঠিক এমনি একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিলাম। চরম বিপন্নতায় ভরা চিন্তা, আমাকে ঘিরে ধরেছিল ‘‘আচ্ছা, আমিই বা শুধু কেন? কেনই বা কেবলমাত্র আমার পরিবার এত আঘাত পেল?’’

অতি সম্প্রতি আমি কিছুটা ভিন্ন উপলব্ধির মুখোমুখি হতে পেরেছি। আমি ও আমার পরিবার যে দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে দিয়ে কাটিয়েছি তাকে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। কিন্তু সময়টিকে সামগ্রিকতায় মূল্যায়ন করলে বুঝতে পারছি সব মিলিয়ে জীবন আমাদের সৎ পথেই নিয়ে গেছে। মানুষের জীবনকে যদি আদিগন্তময় চিরকালীন বহতা গঙ্গা নদীর সঙ্গে তুলনা করি তাহলে এটাই কি দেখি না, যে, গঙ্গা কিন্তু সামনের দিকেই বয়ে চলেছে। আর এই অগ্রসরতাকে বুঝতে পারলে মাঝে মধ্যেই নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে যে খরা হয় আর তা নিয়ে মানুষকে যে কষ্ট স্বীকার করতে হয় সেটা প্রবহমানতারই অংশ বিশেষ মনে হয়। সেরকমই জীবনের হতাশা ও তজ্জনিত ক্ষোভকে যুক্তিসঙ্গতই বোধ হয়।

পরিপ্রেক্ষিতে এটি অবশ্যই একটি শব্দমাত্র। কিন্তু এই শব্দটির বিশ্লেষণ করলে জীবনের দেওয়া ক্লেশ যদি একটু লাঘব হয় সেক্ষেত্রে কঠিন সময়ের মোকাবিলাও কিছুটা সহজে করা যায়। কথাটা ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রেও যেমন সত্যি, সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রেও তাই। আর সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতকে বুঝতে গেলে গুরুত্ব দিতে হবে বাস্তব ঘটনার ওপর, মতামতের ওপর নয়। সম্প্রতি আমি প্রখ্যাত সংখ্যাতত্ত্ববিদ Hans Rosling-এর লেখা ‘Factfulness’ বইটি পড়ছিলাম। এই বইয়ের অন্যতম উপজীব্য হিসেবে লেখক ‘নেতিবাচক প্রবণতা’ (negativity instinct)-এর ওপর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। অধিকাংশ মানুষ নেতিবাচক খবর শুনতে পড়তে ভালবাসে বলে জানিয়েছেন। আর ভালো খবর পাশাপাশি থাকলেও মানুষের নেতিবাচকের দিকেই ঝোঁক বেশি। মূল স্রোতে সংবাদমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়া উভয়েই এখন এই নেতিবাচকতাকেই বেছে নিয়েছে। একটু নজর করলেই দেখা যাবে তারা উপর্যুপরি নেতিবাচক খবরই পরবেশন করে চলেছে। তারা বিশ্বাস করে এতে তাদের দর্শক, পাঠক বাড়বে। এর অর্থই হচ্ছে বেশি অর্থলাভ। আমাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে ভুরি ভুরি দুঃখ কষ্টের খবর বিতরণ মানেই কিন্তু সত্যিই দুঃখ কষ্ট ভয়ঙ্কর বেড়ে গেছে তা নয়।

অনেকে বর্তমান সময়কে ‘ক্রোধের সময়’ বলে চিহ্নিত করেছেন। এই সূত্র ধরে মিডিয়া অহর্নিশি ঢাক পিটিয়ে চলেছে— ওই সত্যিই কী ভয়ঙ্করই না এই সময়। দেখেশুনে মনে হয় মনুষ্য সমাজে এর চেয়ে খারাপ অবস্থা হয়তো আর আসেনি। সামাজিক পরিসরটি সর্বদাই যে মুক্ত আবহাওয়ার কথা বলে সেখানে বইছে নেতিবাচকতার ঝড়। অথচ নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তথ্য ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে যদি চলতি সময়ের গতি বিচার করা হয় তাহলে

> সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতের বিচারে কখনই দুঃখ যন্ত্রণার ভারে কাবু হয়ে পড়লে চলবে না। বরং জীবন যখন তার আশীর্বাদের ডালিও তুলে দেয়, তা থেকে শক্তি নিয়ে যে কষ্টের পর্ব জীবন নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তাকে জয় করার চেষ্টা জরুরি।

বলতেই হবে মানবতার পক্ষে এর চেয়ে ভালো সময় আর আসেনি।

মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম পৃথিবীর বুক থেকে ক্ষুধাকে প্রায় নির্মূল করা গেছে। তাই এখন সমস্যা ক্ষুধা নিয়ে নয়। সমস্যা রয়েছে বিশ্বের দরিদ্রতম অঞ্চলগুলিতে অপুষ্টির। ধনী দেশগুলিতে সমস্যা দেখা দিয়েছে স্থূলতার। কিছু বাচাল মানুষজন হয়তো নিরন্তর এই সাফল্যকে খাটো করে দেখবেন। তা সত্যি নয়। এটা এক বিশাল সাফল্য। পৃথিবীতে আজকের দিনে এমন বহু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যাদের জীবনযাত্রার প্রণালী মাত্র ২০০ বছর আগেকার রাজা রাজড়ার সমগোত্রীয়।

হ্যাঁ, ভারত, আমাদের অপরূপা মাতৃভূমি, ১৯৯১ সালের পর থেকে বিশাল অগ্রগতির রাজপথে বিরাজমান। সেই নয়ের দশকে যখন আমরা আত্মঘাতী সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বেড়াজাল ছিঁড়তে পারলাম, তখনই ছিল শুরু। দু' দশকের বেশি কিছু সময়ে আমরা ২৭ কোটি মানুষকে চরমতম দারিদ্র্য সীমার বাইরে আনতে পেরেছি। আর সাম্প্রতিক কয়েক বছরের গতি প্রকৃতি থেকে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে আমরা আগামী এক দশকের মধ্যেই সামগ্রিক দারিদ্র্য দূরীকরণে সাফল্যলাভ করব। হ্যাঁ, মানতেই হবে আয়ের বৈষম্য নিশ্চয় বেড়েছে। কিন্তু নিশ্চিতভাবে আশা করা যেতে পারে তা কমে আসবে। কেননা আমরা ইতিমধ্যেই ধর্ম ও দানের পথের মর্যাদাকে পুনরাবিষ্কার করতে পেরেছি। চরমতম দারিদ্র্যের এত দ্রুত দূরীকরণের সাফল্য আমাদের সকল দেশনেতা ও জনগণের কৃতিত্বেই সম্ভব হয়েছে। পরিসংখ্যানের নিরিখে যদি কেউ ভারত সংক্রান্ত পরখ করতে চান সেক্ষেত্রে তাঁকে তা করতে হবে মাথা পিছু আয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে মোট পরিসংখ্যানকে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে। উদাহরণ স্বরূপ ভারত বিশ্বের ষষ্ঠতম বৃহৎ অর্থনীতি। কিন্তু তার মানে কখনই এই নয় যে ভারতবাসী বড়লোক। কেননা মাথা পিছু আয়ের নিরিখে আমরা এখনও প্রথম ১০০টি দেশের মধ্যেও নেই। কিন্তু এর মধ্যেও ভালো খবর লুকিয়ে আছে। খোঁড়াখুঁড়ি করে বার করার ইচ্ছে থাকলে বিস্তারে ঢুকতে হবে। পরিসংখ্যান ঘাঁটতে গেলে সব চরিত্রের পরিসংখ্যানই নাড়া চাড়া করতে হবে। প্রথমেই বলতে হবে সারা বিশ্বের মধ্যে ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে ন্যূনতম হিংসা সংঘটিত হয়। মাথা পিছু হিংসার পরিসংখ্যানে মহিলাদের ওপর যৌন হিংসা বাস্তবে ভারতে তুলনামূলভাবে কম। আর এই তুলনা টানা হচ্ছে পশ্চিমি দুনিয়ার ধনী দেশগুলির সঙ্গে। অন্যদিকে মাথা পিছু আয়ের বৃদ্ধির পরিমাণ ভারতে যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। এর মানে অবশ্যই এটা বোঝায় না যে, আমরা নিখুঁত একটা অবস্থায় এসে পৌঁছেছি। সেই পরিপ্রেক্ষিতকে বিবেচনায় রেখে বলতে হয় আমরা কখনই একমুখী আশাবাদী হয়ে বাস্তব সমস্যাগুলিকে এড়িয়ে চলতে পারি না। উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে যদিও যৌন হিংসা পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে তুলনামূলক ভাবে কম, কিন্তু গর্ভস্থ কন্যাভ্রূণের হত্যা পরিসংখ্যানে ভারত অনেক এগিয়ে।

বলতে কী, সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ভারতে এখন গণ-নিধনের পর্যায়ে পৌঁছেছে। যে সমস্ত অসুখকে সহজেই প্রতিরোধ করা যায় যেমন শুধু ডাইরিয়াতেই দেশে লক্ষ লক্ষ শিশুমৃত্যু ঘটে। সহজ বুনিয়াদী স্বাস্থ্য বিধির পালন এ থেকে অনায়াসে মুক্তি দিতে পারে। পরিপ্রেক্ষিত মাথায় রাখলে আমাদের সামনে আরও বহু সমস্যা রয়েছে যার মোকাবিলা আমাদের করতে হবে। দীর্ঘ পথ আমাদের পাড়ি দেওয়া বাকি। সে সম্পর্কে সজাগ থাকা কর্তব্য। কিন্তু একই সঙ্গে যে দীর্ঘ পথ আমরা সফল ভাবে পাড়ি দিয়ে এসেছি সে সাফল্যও আমরা অবশ্যই উদ্‌যাপন করতে পারি। আমাদের দেশের অসামান্য সাফল্যগুলিকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনও রাস্তা নেই। সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতের বিচারে কখনই দুঃখ যন্ত্রণার ভারে কাবু হয়ে পড়লে চলবে না। বরং জীবন যখন তার আশীর্বাদের ডালিও তুলে দেয়, তা থেকে শক্তি নিয়ে যে কষ্টের পর্ব জীবন নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তাকে জয় করার চেষ্টা জরুরি।

একটি কঠিন নির্বাচনের বছর সমাসন্ন। অনেক কিছুই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কদর্যও হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকেই। সকলেই যুদ্ধং দেহি মানসিকতার। অনেকেই বিশ্বাস করতে শুরু করবে আমাদের সমস্যা কী ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে চলেছে। কিন্তু তাই নিয়ে ব্যাপৃত থাকলে ভুল হবে, জীবনের ইতিবাচক পাথেয়গুলি নিয়েই এগোতে হবে। তুল্যমূল্য বিচারে জীবন ইতিবাচকতার কথাই বলে।

*(লেখক জনপ্রিয় সাহিত্যিক)*

# রম্যরচনা

১. জিজ্ঞেস করলাম নন্দীগ্রামের দোষী পুলিশ অফিসাররা কি শাস্তি পেয়ে গেছে?
উত্তর— ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে ওইসব অবলা জীবদের পাশে নিয়ে চলতে হয়।

২. জিজ্ঞেস করলাম—৮১ লক্ষ চাকরিপ্রার্থীর নামের তালিকা কোথায়?
উত্তর— রাজ্যের সব থেকে বড়ো শিল্প অর্থাৎ চপ শিল্পে ঠোঙা বানানোর কাজে ওই তালিকা ব্যবহার করা হচ্ছে।

৩. জিজ্ঞেস করলাম—'নীল-সাদা' রঙে কী এমন বিশেষত্ব আছে যে, সমস্ত সরকারি স্ট্রাকচার নীল-সাদা করতে হবে?
উত্তর—রঙ কোনও ফ্যাক্টর নয় পাগলা, ফ্যাক্ট হলো যে ওই রংটাই ভাইপোর কোটিপতি হওয়ার প্রধান চাবিকাঠি।

৪. জিগ্যেস করলাম—আমাদের রাজ্যে এতো বেকারত্বের জ্বালা, তার ওপরে আপনি সরকারি কর্মচারীদের বেতন দিতে পারছেন না, তবুও রোহিঙ্গাদের পর অবৈধ বাংলাদেশিদের কেন আমাদের রাজ্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, এদের পালন করবে কে?
উত্তর—আমি তো টিকেই আছি এইসব অবৈধ ভোটারদের দৌলতে, এরা তোদের ট্যাক্সের পয়সাতেই খাবে এবং আমাকে টিকিয়ে রাখবে...তাছাড়া মানবিকতাও তো একটা ব্যাপার নাকি।

৫. জিজ্ঞেস করলাম—২০০৫-এ এই মানবিকতা ছিল না কেন?
উত্তর—তখনকার পরিস্থিতির জন্য ওটাই ঠিক ছিল, আর এখনের জন্য মানবিকতার সেন্টিমেন্ট জরুরি। মোটামুটি ভোটের জন্য হাওয়া বুঝে এই লেভেলের গিরগিটি হতে হয়।

# উবাচ

"আমি বলি দিদি রংয়ের রাজনীতি ছাড়ুন, মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করুন। বিজেপি ২২টি রাজ্য ক্ষমতায় রয়েছে, কোথাও রংয়ের রাজনীতি করেনি।"

**দিলীপ ঘোষ**
রাজ্য বিজেপির সভাপতি

***মুখ্যমন্ত্রীর অটোর রং নীল-সাদা করা প্রসঙ্গে***

"আমি এশিয়ান গেমসের পদকটি সদ্য প্রয়াত পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীকে উৎসর্গ করতে চাই।"

**বজরং পুনিয়া**
কুস্তিগীর

***এশিয়ান গেমসে পদক জেতার পর টুইটবার্তায়***

"ঘটনাচক্রে আমি তখন পিঠ পেতে দিয়েছিলাম ঠিকই। তবে আমার চোদ্দজন সঙ্গীর অবদান ভুললে চলবে না। আমার একার পক্ষে উদ্ধারকাজ চালানো সম্ভব ছিল না।"

**কে পি জয়সল**
কেরলে বানভাসিদের উদ্ধারকর্মী

***বানভাসিদের পিঠে করে নৌকায় তোলা প্রসঙ্গে***

"প্রতিদিন আমাদের জওয়ানরা শহিদ হচ্ছে। সেই কারণে পাক সেনাবাহিনীর প্রধান বাজওয়াকে (সিঁধুর) আলিঙ্গনের বিরোধী আমি।"

**ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংহ**
পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী

***পাক সেনাপ্রধানকে নভজ্যোত সিংহ সিঁধুর আলিঙ্গন প্রসঙ্গে***

# এন আর সি-র স্ক্যানারে বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের নীল নকশা

**সাধন কুমার পাল**

অসমের এন আর সি অর্থাৎ ন্যাশনাল রেজিস্টার অব সিটিজেন সম্পূর্ণভাবে একটি সাংবিধানিক ও আইনি বিষয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, খসড়া নাগরিকপঞ্জি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এই ইস্যুটিকে মেঠো রাজনীতির রঙ মাখিয়ে পথে নেমেছেন তৃণমূল নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, এতে নাকি গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে, রক্তপাত হবে। নোট বাতিলের সময়েও ঠিক এইভাবেই মাঠে নেমে এমন উস্কানিমূলক কথা বলে মানুষকে অস্থির করে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি, যাতে মানুষ ক্ষেপে গিয়ে ব্যাঙ্ক এ. টি. এম.গুলিতে আগুন ধরিয়ে দেয়, দেশজুড়ে এক অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হয়। কিন্তু শত প্ররোচনা সত্ত্বেও মানুষ শান্ত থেকেছে। সৌভাগ্যের বিষয় যে, চল্লিশ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়া সত্ত্বেও খসড়া নাগরিক পঞ্জি প্রকাশকে ঘিরে অসমের মতো সংবেদনশীল রাজ্যে একটিও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এতে দুটি বিষয় পরিষ্কার। এক, অসমের জনতা যথেষ্ট সমঝদার, ওঁরা কোনওরকম প্ররোচনার ফাঁদে পা দেননি। দ্বিতীয়ত, রাজ্যের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার রাজ্যের সমস্ত জনগোষ্ঠীর মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

এন আর সি নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্তমান অবস্থান দেখলে কে বলবে তিনি ১৯৮৫ সালের ১৫ আগস্ট এন আর সি-র আত্মা অসম চুক্তি স্বাক্ষরের সময় যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসের ফায়ারব্র্যান্ড তরুণী সাংসদ ও যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা হিসেবে রাজীব গান্ধীকে সমর্থন জুগিয়েছেন। ২০০৫ সালে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সংসদে আলোচনার দাবিতে স্পিকারের টেবিলে কাগজ ছুঁড়ে মারেন ও শেষে পদত্যাগও করেন। সত্যিই রাজনীতির এই কল্কি অবতারের ডিগবাজি দেখলে কবি হয়তো বলে উঠতেন, দেশ কিংবা মানুষ নয়, সবার উপরে ক্ষমতার লালসা সত্য, তাহার উপরে নাই।

২০১২ সালে অসম সম্মিলিতা সঙ্ঘের তরফে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা হয়। এই মামলার শুনানি শেষে ২০১৪ সালের ১৭ ডিসেম্বর সর্বোচ্চ আদালত একটি আদেশ দেয়, যাতে এন আর সি আপডেট করতে বলা হয়। ১৯৮৫ সালে অল অসম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, অসম গণ পরিষদ ও রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় একটি চুক্তি, যা 'অসম চুক্তি' নামে খ্যাত। এই চুক্তি অনুসারে ঠিক হয় ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ মধ্য রাত পর্যন্ত যারা বসবাসের উদ্দেশ্যে অসমে প্রবেশ করেছে তারাই ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গণ্য হবে, এরপর থেকে যারা বসবাস করছে তাদের বিদেশি বলে গণ্য করা হবে। এই অসম চুক্তির ভিত্তিতেই শুরু হয় এন আর সি আপডেট।

> **দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতের শত্রুদের সুরে সুর মিলিয়ে মুসলমান ভোটব্যাঙ্কের সস্তা আত্মঘাতী রাজনীতিতে শামিল হয়েছে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকার।... মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বাধীন বর্তমান শাসক দলের এই সমস্ত পদক্ষেপ যে বৃহত্তর বাংলাদেশ নামক ইসলামিক সাম্রাজ্য গঠনের সহায়ক হয়ে উঠছে এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।**

২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে অসমের বাসিন্দাদের কাছ থেকে তাদের নাগরিকত্ব প্রমাণের নথি জমা নেওয়া হয়। ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর এই প্রক্রিয়া শেষ হয়। ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসেই এন আর সির প্রথম খসড়া তালিকায় ৩ কোটি ২৯ লক্ষ আবেদনকারীর মধ্যে ১ কোটি ৯০ লক্ষ ভারতীয় নাগরিকের নাম প্রকাশ করা হয়। সেই সঙ্গে দ্বিতীয় তালিকা খুব শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়। গত ৩০ জুলাই চূড়ান্ত খসড়া তালিকা প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে, ৪০ লক্ষ মানুষ এই তালিকার বাইরে রয়েছে। যারা তালিকার বাইরে রয়েছেন তারা ৭ আগস্ট ২০১৮ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত আবার আবেদন করতে পারবেন এবং এটা জানতেও পারবেন এন আর সি-তে তাদের নাম কেন বাদ দেওয়া হলো।

ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগের পর থেকে পাকিস্তানে শুরু হয় নির্বিচার হিন্দু নিধন, হিন্দু নারীদের উপর নারকীয় অত্যাচার ও হিন্দু সম্পত্তি দখল। তথ্য বলছে, বিশ্বে এতবড় সংগঠিত নরসংহারের দৃষ্টান্ত আর নেই। মা-বোনেদের ইজ্জত খুইয়ে সর্বস্ব হারিয়ে ইসলামিক জল্লাদদের হাত থেকে শুধুমাত্র প্রাণে বাঁচতে কয়েক কোটি হিন্দু শরণার্থী হয়ে আশ্রয় নেয় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতে।

পাকিস্তান ভাগ হয়ে বাংলাদেশ গঠনের সময়ও সংগঠিত হয় নির্বিচার হিন্দু সংহার। উদ্বাস্তু স্রোত আছড়ে পড়ে পশ্চিমবঙ্গে। সে সময় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, ভারত উদ্বাস্তুদের মানবিক সহায়তা দিচ্ছে, কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার তারা স্বভূমে ফিরে যাবে— এটাই স্বাভাবিক।

বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রায় পাঁচ দশক হয়ে গেলেও সেই স্বাভাবিক পরিস্থিতি তো দূরের কথা, যে সমস্ত হিন্দু মাটি কামড়ে পড়ে ছিলেন তাঁরাও ধীরে ধীরে এদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে দেশভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) ও পাকিস্তানে যেখানে যথাক্রমে ৩০ শতাংশ ও ২৪ শতাংশ হিন্দু ছিল, এখন কমে সেটা ৭ শতাংশ ও ১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

হিন্দু বিতাড়ন সম্পূর্ণ করে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করে জেহাদি গোষ্ঠীগুলি। পশ্চিমবঙ্গ অসম সহ উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলি নিয়ে আরও বৃহত্তর ইসলামিক সাম্রাজ্য 'গ্রেটার বাংলাদেশ' তৈরির নীল নকশা ছকে ফেলে। এই নকশা রূপায়ণের জন্য 'লেবেনশ্রম' তত্ত্বের দোহাই দিয়ে পরিকল্পিত মুসলিম অনুপ্রবেশ ঘটাতে থাকে। শোনা গেছে, ৬-এর দশকে রংপুরে অসমীয় ভাষা শিখিয়ে অসমে মুসলিম অনুপ্রবেশ করানো হতো, যাতে ওরা নিজেদের অসমের আদি বাসিন্দা হিসাবে পরিচয় দিতে পারে। নিজেদের অসমীয় প্রতিপন্ন করতে বাংলাদেশি মুসলমানরা জনগণনাতেও নিজেদের মাতৃভাষা অসমীয় উল্লেখ করতে থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজকে দুর্বল করার জন্য অসমীয় হিন্দু ও বঙ্গভাষী হিন্দুদের মধ্যে নানা উপায়ে ঘৃণা ছড়িয়ে দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা হতো। এই সমস্ত উপায়ের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য উপায় হলো, কোনও অসমীয় বা বঙ্গভাষীর মধ্যে কাউকে খুন করে কিংবা ধর্ষণ করে গুজব রটিয়ে দিয়ে দাঙ্গা বাধানো।

একসময় অসমের মাটিতে স্লোগান উঠত 'মিয়া অসমিয়া ভাই ভাই, বাঙালির (পড়ুন বাঙালী হিন্দুর) ঠাঁই নাই / রক্ত চাই।' মোট কথা, ছয় ও সাতের দশকে পরিকল্পনা করে বাড়তি জনসংখ্যার চাপে বিপন্নতা বোধ থেকে জেগে ওঠা উগ্র অসমীয় সেন্টিমেন্টের অভিমুখকে সম্পূর্ণভাবে বঙ্গভাষী হিন্দুদের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য নানারকম কূটকৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়। এটি একটি গভীর ষড়যন্ত্রের ফসল। সন্দেহ নেই এই গভীর ষড়যন্ত্রের জন্যই একসময় অসমের নাম শুনলেই মানুষের চোখে ভেসে উঠত জাতিদাঙ্গা, বন্‌ধ, নরসংহার, বাঙালি হিন্দু বিতাড়ন, সন্ত্রাসবাদী হামলার চিত্র।

এদিকে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে নীরবে ভারত দখল ষড়যন্ত্রের পরিপূরক হয়ে উঠে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিএমর মতো পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলি। এই সমস্ত দল 'অসহায় দরিদ্র মানুষকে সাহায্য' নামক মানবতার মোড়কে ভোটব্যাঙ্ক তৈরির লক্ষ্যে বছরের পর বছর ধরে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড ধরিয়ে দিয়েছে। পরিসংখ্যানে চোখ রাখলেই স্পষ্ট হবে যে, একদিকে অনুপ্রবেশ ও অন্যদিকে ইসলামে জন্ম নিয়ন্ত্রণ নিষিদ্ধ ফতোয়া দিয়ে 'হাম পাঁচ, হামারা পঁচিশ' নীতি অনুসরণে উৎসাহ যুগিয়ে ইসলামিক জেহাদিরা অসমের জনচরিত্রের ভারসাম্য পাল্টে দিয়েছে। অসমের নয়টি জেলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। হিন্দু মেয়েদের ছলে বলে বিয়ের নামে ধর্মান্তরিত করা, হিন্দু সম্পত্তি জবরদখল, চুকি-ডাকাতি থেকে শুরু করে সমস্ত দেশবিরোধী অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে এই সমস্ত এলাকা।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভাবাদর্শে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সংগঠনের অনলস প্রয়াসের ফলে আশির দশক থেকে পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে শুরু করে। অসমকে নিয়ে ষড়যন্ত্রের স্বরূপ সম্পর্কে মানুষ সচেতন হতে শুরু করে। বঙ্গভাষী হিন্দুরা বিপন্ন হলে অনেক জায়গাতেই সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে বিপন্ন হবে ভূমিপুত্র অসমীয়দের অস্তিত্ব। ফলে ভাষা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বিভেদ সৃষ্টি না করে যে কোনও মূল্যে হোক হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। উগ্র অসমীয় সেন্টিমেন্টের জায়গায় স্থান করে নিতে থাকে এই ভাবনা। ফলে বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দুদের শরণার্থীর মর্যাদা দিয়ে নাগরিকত্ব আইনের ২০১৬ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে নাগরিকত্ব প্রদানের দাবি অসমের মাটিতে ক্রমশই শক্তিশালী হচ্ছে।

এন আর সি-তে চল্লিশ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়ার পরেও অসম শান্ত। চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশের পর একটিও ঘটনা ঘটেনি। সন্দেহ নেই বিশ্ববাসী এক নতুন অসমকে দেখছে। এই চল্লিশ লক্ষের মধ্যে বেশ ভালো সংখ্যায় অসমের মূল বাসিন্দাও রয়েছেন। সবাই মাথা ঠাণ্ডা রেখে চূড়ান্ত তালিকায় নিজেদের নাম অন্তর্ভুক্তির প্রয়াস করছেন, এটা কম বড় কথা নয়। অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে অসমকে নিয়ে বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের ষড়যন্ত্রকারীরা বসে নেই, সে প্রমাণও ইতিমধ্যেই আসতে শুরু করেছে। ভারতীয় মুসলমানের সঙ্গে বাংলাদেশি মুসলমানদের জুড়ে দিয়ে মুসলমান বিতাড়ন, বাঙালি বিতাড়নের আতঙ্ক ছড়ানোর প্রয়াস হচ্ছে। বলা হচ্ছে, মায়ানমার যেভাবে রোহিঙ্গাদের তাড়িয়েছে, ঠিক সেইভাবে ভারত মুসলমানদের তাড়াবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতের শত্রুদের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলে মুসলমান ভোটব্যাঙ্কের সস্তা আত্মঘাতী রাজনীতিতে শামিল হয়েছে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকার।

অসম সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ১ লক্ষ ২০ হাজার বাঙালির এন আর সি সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করার জন্য পাঠিয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ মাত্র ১৫ হাজার তথ্য যাচাই করে পাঠায়। এতবড় অসহযোগিতা করেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে চলা এন আর সি প্রক্রিয়াকে বাঙালি বিতাড়নের ষড়যন্ত্র হিসাবে উল্লেখ করেছেন কার স্বার্থে? তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে হিন্দু বাঙালি উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৬-এর বিরোধিতা কার স্বার্থে? অসম ও পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ভারত বাংলাদেশের সীমান্ত দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ২৫৬ কিমি ও ২২১৭ কিমি। অসমে যদি এত বিরাট সংখ্যায় অনুপ্রবেশকারী ঢুকতে পারে তাহলে অসমের তুলনায় প্রায় নয়গুণ বেশি দৈর্ঘ্যের সীমান্ত দিয়ে কত বাংলাদেশি মুসলমান ঢুকতে পারে তা এই মুহূর্তে কল্পনা করাও কঠিন। জেনে বুঝে হোক আর না জেনে হোক মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বাধীন বর্তমান শাসক দলের এই সমস্ত পদক্ষেপ যে বৃহত্তর বাংলাদেশ নামক ইসলামিক সাম্রাজ্য গঠনের সহায়ক হয়ে উঠছে এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সব মিলে বলা যায়, বারুদের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ। ইসলামিক জেহাদিদের এই নীল নকশাকে সর্বসমক্ষে আনতে পশ্চিমবঙ্গেও অনতিবিলম্বে এন আর সি-র কাজে হাত দেওয়া প্রয়োজন। ■

*(সম্প্রতি টাইমস অব ইন্ডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। স্বস্তিকার পাঠকদের জন্য সাক্ষাৎকারটির অংশবিশেষের অনুবাদ প্রকাশিত হলো। স. স্ব।)*

# অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে ফিরে আসবে এনডিএ : নরেন্দ্র মোদী

**□ এই সময় থেকে শুরু করে ২০১৯-র লোকসভা নির্বাচনের সময় পর্যন্ত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আপনার সরকার কী ধরনের কাজ করতে চায়?**

**নরেন্দ্র মোদী :** নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে কাজ করা আমার সরকারের নীতি নয়। এ কথা সকলেই জানেন। দেশের উন্নয়নকে আরও গতিময় করতে আমাদের কিছু লক্ষ্য রয়েছে, যার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ঘটবে ২০২২-র পর থেকে। সুতরাং এই সরকার ২০২২-এর কথা মাথায় রেখেই কাজ করবে।

**□ আপনার সরকার বলছে গত চার বছরে অবৈধ ঋণ নেওয়ার প্রবণতা কমেছে। আবার কর্পোরেট সেক্টরের দাবি, এই সরকারের আমলে আইনি কড়াকড়ি অনেক বেড়েছে। দেউলিয়া আইন থেকে আয়কর আইন, তারপর কোম্পানি আইন এবং জিএসটি— এই সবই ভারতের চালু সিস্টেম হয়ে গেল?**

**নরেন্দ্র মোদী :** ব্যবসা করতে গিয়ে ব্যবসায়ীরা যাতে অনর্থক হয়রানির সম্মুখীন না হন সে ব্যাপারে এই সরকার দায়বদ্ধ। আবার ব্যবসাক্ষেত্রে সুযোগ আরও বাড়াতে গিয়ে কোনও অসৎ ব্যক্তি যাতে তার অন্যায় সুযোগ না নেয়, সেটা দেখাও সরকারের কর্তব্য। বিশ্বব্যাঙ্কের সমীক্ষায় ব্যবসাক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্যের নিরিখে ভারত ১৪২ থেকে ১০০-তে উঠে এসেছে। এটা প্রমাণ করে, ভারতে ব্যবসাবাণিজ্য করা আগেকার তুলনায় এখন অনেক সহজ। আইনকানুনের ক্ষেত্রেও পদ্ধতিগত জটিলতা অনেকটাই দূর করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু অসৎ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি তাই বলে নরম হয়নি।

কালো টাকা এবং দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যে আমরা যে অভিযান শুরু করেছি তাতে এখনও পর্যন্ত ২.৬ লক্ষ ভুয়ো কোম্পানি এবং ৩.০৯ লক্ষ ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই আগস্ট মাসেই আরও ৫৫,০০০ কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে আয়করের রিটার্ন জমা দেওয়ার ফর্ম আরও সহজ করা হয়েছে। এতে সুবিধে হয়েছে আয়কর দপ্তরেরও। স্ক্রুটিনির কাজ ০.৩৫ শতাংশ কমে গেছে।

**□ ব্যাঙ্কিং সেক্টরের অধোগতির ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা নেতিবাচক। বিশেষ করে জানতে চাইব রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির সংস্কারের ব্যাপারে সরকার কী ভাবছে? ব্যাঙ্কের কাজকর্মও দিন-দিন আরও খারাপ হচ্ছে। আপনার কী মনে হয়, পুরো ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে আর কত সময় লাগবে?**

**নরেন্দ্র মোদী :** আমাদের আগে বোঝা দরকার ব্যাঙ্কের অনুৎপাদক সম্পদের (নন-পারফরমিং অ্যাসেট) পরিমাণ বেড়ে গেল কেন? ইউপিএ-২ আসলে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে শোধ করা হতো না। সেই সময় একটা ব্যবস্থা চালু হয়েছিল যার নাম, 'টেলিফোন ব্যাঙ্কিং'। এই ব্যবস্থায় ব্যাঙ্কে সরাসরি টেলিফোন করে নির্দেশ দেওয়া হতো। এরপর ঋণের আবেদন মঞ্জুর করার ব্যাপারে কোনও বাধাই থাকত না।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বিপুল অনাদায়ী ঋণের পিছনে রয়েছে সেই টেলিফোন ব্যাঙ্কিং। আমরা অনাদায়ী ঋণ আদায় করার জন্য এবং ব্যাঙ্কগুলির হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এনেছি। ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন আইনেরও (১৯৪৯) সংশোধন করা হয়েছে। আরও একটা খবর দিই, ৩৯ জন ঋণখেলাপির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এরা ব্যাঙ্ক থেকে মোট ২.৬৯ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে শোধ করেনি। জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনালে এখন এদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে। ব্যাঙ্কের স্বাস্থ্য ফেরাতে ৭০,০০০

কোটি টাকা আগেই দেওয়া হয়েছিল, ইন্দ্রধনুষ প্রকল্পে রিক্যাপিটালাইজেশনের জন্য ২০১৭-র অক্টোবরে আরও ২.১১ লক্ষ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

**□ আপনার সরকার যথেষ্ট কর্মসংস্থান করতে পারেনি বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে। সংগঠিত ক্ষেত্রে চাকরি তো প্রায় নেই বললেই চলে, পেশাদারি ক্ষেত্র এবং আউটসোর্সিং-ই যা ভরসা। চীনের রপ্তানি বাণিজ্য-মডেল কি এক্ষেত্রে বেশি কার্যকরী বলে আপনার মনে হয় না? এই মডেলে অঢেল চাকরি মেলে।**

**নরেন্দ্র মোদী :** এই সরকার যথেষ্ট চাকরি তৈরি করতে পারেনি বলে যে হৈচৈ শুরু হয়েছে সেটা তথ্যের অভাবে। চাকরি সংক্রান্ত ইনফর্মেশন যদি হাতের কাছে না থাকে, আমার বিরোধীরা তার সুযোগ নিয়ে সরকারকে দোষারোপ করবেই। আমরা মানুষকে সব তথ্য জানানোর কাজ শুরু করেছি। ইপিএফও, ইএসআই এবং এনপিএসের চাকরি সংক্রান্ত তথ্য ওয়েবসাইটে দেওয়ার কাজ চলছে।

ইপিএফও-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুধুমাত্র সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে এপ্রিল ২০১৮-র মধ্যে ৪৫ লক্ষ প্রথাগত চাকরি তৈরি হয়েছে। গত বছরে মোট চাকরির পরিমাণ ছিল ৭০ লক্ষ (সূত্র ইপিএফও)। আপনারা সকলেই জানেন, আমাদের দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন। এটাও জানা আছে, সংগঠিত ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ বাড়লে অসংগঠিত ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়ে। একটা উদাহরণ দিই, গ্রামীণ ক্ষেত্রে ৩ লক্ষ প্রশিক্ষিত কার্যকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। এরা বিভিন্ন গ্রামে সেবাকেন্দ্র চালান। এইসব সেবাকেন্দ্র গ্রামে কর্মসংস্থানের গুরত্বপূর্ণ উৎস। সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ১৫,০০০ স্টার্ট আপ গ্রুপ রয়েছে। এরা নানাভাবে চাকরির সুযোগ তৈরি করছে। মুদ্রা যোজনায় ১২ কোটিরও বেশি আবেদনকারীকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। যদি ধরে নেওয়া যায় ঋণ নিয়েছেন এরকম প্রত্যেক ব্যক্তি অন্তত একজনকে চাকরি দিয়েছেন, তাহলে সেটা কি অযৌক্তিক ভাবনা হবে?

> কংগ্রেস আগে বলত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির ওপর তাদের আস্থা নেই। এখন আবার ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের তদারকিতে চলা নাগরিক পঞ্জিকরণের ওপরেও তাদের আস্থা নেই। জাতীয় স্বার্থে নাগরিক পঞ্জিকরণ হচ্ছে। যেখানে জাতীয় স্বার্থের প্রশ্ন রয়েছে সেখানে রাজনীতির কোনও জায়গা নেই।

এরপর রয়েছে বিপুল নির্মাণকাজ। তা সে রাস্তা তৈরি হোক বা রেলপথ তৈরি— প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষ কাজ পেয়েছেন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে ভারতে দারিদ্র্য ক্রমশ কমছে। মানুষের কর্মসংস্থান না হলে কি এই আর্থিক বৃদ্ধি সম্ভব? ভারতে বেড়াতে আসা বিদেশি ট্যুরিস্টদের সংখ্যা যদি একটা মাপকাঠি হয় তাহলে ২০১৭ সালে পর্যটন শিল্পে ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। পর্যটন শিল্পে সব থেকে বেশি চাকরি তৈরি হয়। আমরা যখন পর্যটন শিল্পের বৃদ্ধির কথা বলছি, তখন সেই বৃদ্ধি কি কর্মসংস্থান ব্যতিরেকে সম্ভব? পশ্চিমবঙ্গ বলছে সেখানে ৬৮ লক্ষ বেকারকে চাকরি দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কর্ণাটকের আগেকার সরকার বলেছিল সেখানে ওই সংখ্যাটি ৫৩ লক্ষ। দেশের মাত্র দুটি রাজ্যে কর্মসংস্থান হলো, বাকি অংশে হলো না, এও কি সম্ভব? চাকরি নেই বলে বিরোধীদের এই চিৎকার রাজনৈতিক গিমিক ছাড়া আর কিছুই নয়।

**□ অসমের জাতীয় নাগরিকপঞ্জি নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগ, বিজেপি বিভেদের রাজনীতি করছে। পঞ্জিতে যাদের নাম ওঠেনি সেই ৪০ লক্ষ মানুষের ভবিষ্যৎ এখনও স্পষ্ট নয়।**

**নরেন্দ্র মোদী :** ১৯৭২ সালে ইন্দিরা গান্ধী ও মুজিবুর রহমানের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল তার একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাদের নিজের দেশে ফেরত পাঠানো। পরে, ১৯৮৫ সালে রাজীব গান্ধী আর আসুর মধ্যে যে চুক্তি হয় সেখানেও এই শর্ত বহাল রাখা হয়। কিন্তু কংগ্রেস মুসলমান ভোট হারাবার ভয়ে এই চুক্তি কার্যকর করেনি। রাজনৈতিক ইচ্ছে বা সাহস কোনওটাই তাদের ছিল না। আমাদের অন্যতম প্রধান নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল জাতীয় নাগরিকপঞ্জির রূপায়ণ। আমরা কথা রেখেছি। ৪০ লক্ষ মানুষের প্রশ্নে বলতে পারি, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী না হলে তাদের কোনও ভয় নেই।

**□ বিরোধীদের মহাজোট নিয়ে কী বলবেন?**

**নরেন্দ্র মোদী :** তিরিশ বছর পর কেন্দ্রে একটি সক্রিয় শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল সরকার এসেছে। কোয়ালিশন সরকার নিয়ে এ দেশের মানুষের তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই ধরনের সরকার রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার শিকার হয়। আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষের মানুষ এমন কোনও মহাজোটকে ভোট দিয়ে তাদের ভোট নষ্ট করবেন না, যাদের কোনও রাজনৈতিক আদর্শ নেই। এবং যাদের একটাই লক্ষ্য, যেমন করে পারো মোদীকে হটাও।

**□ এত বছর ক্ষমতায় থাকার পর কী মনে হচ্ছে ২০১৪-র ফল ২০১৯-এ করতে পারবেন? বিজেপি দলীয় ভাবে এবং এনডিএ সামগ্রিক ভাবে কত আসন পাবে বলে মনে হয়?**

**নরেন্দ্র মোদী :** গত চার বছরে আমরা অসম্ভব পরিশ্রম করেছি। আমি সরকারের কাজ এবং সাফল্যের খতিয়ান নিয়ে মানুষের কাছে যাব। বিজেপি যে আগের মতোই মানুষের ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ পাবে সে ব্যাপারে আমি আত্মবিশ্বাসী। আমরা অবশ্যই গতবারের তুলনায় বেশি আসন পাব এবং এনডিএ অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে আবার ফিরে আসবে। মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন। সুতরাং আমাদের ভয় পাওয়ার কোনও কারণই নেই। ■

# ২০১৯-এ গরিষ্ঠাংশ দেশবাসীর পছন্দের তালিকায় নরেন্দ্র মোদী

**“অটলবিহারী বাজপেয়ীর পরে দেশবাসী নরেন্দ্র মোদীর মতো দেশভক্ত রাষ্ট্রনেতা পেয়েছে। যাঁর লক্ষ্য রয়েছে ভারতকে আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসানো।”**

**ড. জিষ্ণু বসু**

গত বছর জুন মাসে আমেরিকা পাকিস্তানকে সন্ত্রাসের মুক্ত স্বর্গ হিসেবে ঘোষণা করে। মার্কিন সরকার পরিষ্কার বলেছে, লস্কর-ই-তইবা এবং জামাত-ই-মুজাহিদিন প্রতিনিয়ত সন্ত্রাসের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, সংগঠিত করছে এবং বিশ্বে সন্ত্রাস ছড়ানোর কাজে ব্যবহার করছে। মার্কিন স্বরাষ্ট্র দপ্তর ‘কান্ট্রি রিপোর্ট অন টেররিজম্-২০১৬’ প্রকাশ করেছে, তাতে দেখানো হয়েছে যে, ২০১৬ সালে ওই দুই জঙ্গি সংগঠন পাকিস্তান জুড়ে দেদার টাকা তুলেছে। মার্কিন সরকারের এই ঘোষণা ভারতের জন্য বিগত বহুদিনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কূটনৈতিক জয়। যে জিহাদি সন্ত্রসবাদ ভারতের কাশ্মীর থেকে কালিয়াচক পর্যন্ত মানুষের শান্তি সমৃদ্ধি নষ্ট করছে, জনজীবনকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে, সে বিষয়ে বিশ্বজনমত গঠনে সফল হয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকার।

বিমুদ্রীকরণের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছিল কাশ্মীরের সন্ত্রাস ব্যবসায়ীদের ওপর। পাঁচশো ও হাজার টাকার নোট বাজার থেকে উঠে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীর উপত্যকা থেকে পাথর ছোঁড়া বন্ধ হয়ে গেছে। পাকিস্তানে ভারতীয় জালনোটের কারবারিদের সঙ্গে কাশ্মীরের জঙ্গি সংগঠনগুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ৫০০ ও ১০০০ টাকার জালনোট ব্যবহার করা হতো সন্ত্রাস ছড়ানোর কাজে। একটি কাশ্মীরি যুবককে দেওয়া হতো এক বস্তা পাথর ও একটি ৫০০ টাকার নোট। সে সারাদিন সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়বে। এই শয়তানি বন্ধ হওয়ায় কাশ্মীরের সমর্থক প্রগতিবাদীদেরও মুখ বন্ধ হয়েছে। সেই রাগেরই প্রকাশ করেছিলেন পার্থ চ্যাটার্জি ‘দ্য ওয়ার’ পত্রিকায়। সেখানে তিনি দেশভক্ত সাহসী সেনানায়ক মেজর নিতুল গগৈকে অত্যাচারী ইংরেজ জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকারী জেনারেল ডায়ারের সঙ্গে তুলনা করেন। কান টানলে মাথা তো আসবেই।

নরেন্দ্র মোদী সরকার আর্থিক সংস্কারের কাজ স্বদেশের প্রতি পূর্ণ ভালোবাসা নিয়ে করছে। ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশ সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জায়গায় পৌঁছেছে। ২০১৫ সালে ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড (আই এম এফ)-এর হিসাব অনুসারে ভারতের জিডিপি পাঁচগুণ বেড়ে ২.২ কোটি মার্কিন ডলার হয়েছে। ২০১৫-র জানুয়ারি থেকে মার্চ ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি ছিল ৭.৫%, যেখানে চীনে ৭% বৃদ্ধি হয়েছিল।

আজও ৭৫% শ্রমিক ওই ক্ষুদ্র, মাঝারি বা গুচ্ছশিল্পে কাজ করছেন। এই যে অভূতপূর্ব শক্তি তাকে জাগানোর জন্য এই প্রথম কোনও কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করছে। এ বিষয়ে ‘মিনিস্ট্রি অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রিনিয়র’ নামে একটি মন্ত্রক তৈরি হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন এই সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল। সহজে কৃষিঋণ পাওয়ার জন্য মোদী সরকার মুদ্রা যোজনা শুরু করে। এপর্যন্ত ১৩ কোটি ৩৭ লক্ষের কিছু বেশি মুদ্রা যোজনায় ঋণ অনুমোদন হয়েছে।

এবছরের জুন মাসে দেশের বামপন্থী, অতি বামপন্থী সংগঠন এবং আম কিষান ইউনিয়ন নামে একটি সংগঠন মিলিতভাবে রাষ্ট্রীয় কিসান মহাসঙ্ঘ নাম দিয়ে দেশ জুড়ে আন্দোলন তৈরি করে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এরা শহরে শহরে উৎপাদিত সবজি রাস্তায় ছড়িয়ে দেয়। ১০ জুন ভারত বন্ধও ডাকে। এর নেপথ্যে থেকে অতি বাম নেতৃত্ব মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানায়

কৃষিঋণ মকুবের দাবিতে অরাজকতা শুরু করে। কিন্তু সাধারণ ভাবে খরা বা বন্যা না হলে কৃষিঋণ মকুব হয় না। ধীরে ধীরে নেপথ্যে থাকা কংগ্রেস, আপ ও বাম দলগুলির স্বার্থান্বেষী চেহারা সরল কৃষকদের চোখে ধরা পড়ে। ভারত বন্ধও হয়নি আর কৃষকরা এই বিশৃঙ্খলা থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়।

অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন ড. এপিজে আবদুল কালাম। বিজ্ঞান তপস্বী মানুষটি একটি বই লিখেছিলেন' ইন্ডিয়া ২০২০— এ ভিশন'। সত্যি বলতে কী, ভারতবর্ষ ২০২০ সালে নিজেকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে আসবে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সারা পৃথিবী। বৈজ্ঞানিক ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে দেশকে চেনা , দেশকে ভালোবাসা। ভারতে স্মার্ট সিটি যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন আয়ুসের মতো এক মন্ত্রক , যে মন্ত্রক ভারতে হাজার হাজার বছরের গবেষণার ধন— আয়ুর্বেদ ও যোগের মতো জ্ঞানকে আজকের বিজ্ঞানের সঙ্গে উপযোগী করে পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করবে। গান্ধীজী যে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন, স্বাধীনতার এত বছর পরে কোন সরকার তাকে অগ্রাধিকার দিল? স্বচ্ছ ভারত অভিযানের যারা বিরোধিতা করেছিলেন, যাঁরা হাসি ঠাট্টা করেছিলেন তাঁদের মুখে চুনকালি দিয়ে দেশের আপামর মানুষ নিজেদের পরিবর্তন করেছে, নিজেদের পরিবেশকে অনেক সুন্দর বানিয়েছে। যে জিহাদি সন্ত্রাস, মাওবাদ ও অতি বামদের শহরকেন্দ্রিক সমর্থন ২০১২-১৩-তে অপ্রতিরোধ্য ভাবে মাথা তুলেছিল, এই অশুভ সমন্বয় আজ সাধারণ মানুষদের থেকে বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন। তাই এই বিপুল সম্ভাবনা আর ভয়ানক চ্যালেঞ্জের পরিস্থিতিতে দেশমাতৃকাকে পরমবৈভবশালী করার জন্য প্রয়োজন ছিল এক যোগ্য নেতৃত্বের। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর আপোশহীন সংগ্রাম, দেশের ছোটো ছোটো উন্নয়নের প্রতি মনোযোগ, ব্যক্তি জীবনের সারল্য, সর্বোপরি দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন দেশের মানুষের মনে ভরসা এনেছে। গত মে মাসে টাইমস্ গ্রুপ দেশের পছন্দের প্রধানমন্ত্রীর যে ওপিনিয়ন পোল করেছিল, তাতে ৭১.৯% ভারতীয়ের পছন্দের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রভাই মোদী। এবিপি নিউজ সি ভোটারের অতি সম্প্রতি ওপিনিয়ন পোলে সারা দেশে ৫৪% মানুষ সরাসরি নরেন্দ্র মোদীর পক্ষে আর ২৩% মানুষ রাহুল গান্ধীকে পছন্দ করেছেন। জনপ্রিয় হিন্দি 'দৈনিক ভাস্কর' মানুষের সামনে পরিষ্কার চারটি প্রশ্ন রেখেছে। প্রথম প্রশ্ন মোদীর জনপ্রিতা। ৪৭% মানুষ মনে করেছেন মোদী ২০১৪ সালের থেকে বেশি জনপ্রিয় হয়েছেন। ২৩% মানুষ মনে করেন মোদী আগের মতোই জনপ্রিয়। ৩০% মানুষ বলেছেন জনপ্রিয়তা কমেছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, রাহুল গান্ধী কি মোদীর মোকাবিলা করতে পারবেন? ৪৮% বলেছেন মোদীর সঙ্গে রাহুলের কোনও তুলনাই হয় না। ৩০% লোক মনে করেন, মোদীর সঙ্গে রাহুল পেরে উঠবেন না। ২২% বলেছেন , রাহুল পারবেন। তৃতীয় প্রশ্ন ছিল, বিপক্ষ দলগুলি একজোট হয়ে কি মোদীকে হারাতে পারবে? ৫৩% দেশবাসী বলেছেন, মোদীর বিরুদ্ধে একজোট হয়েও কোনও লাভ হবে না। ২৪% মানুষ মনে করেন, বিরোধী দলগুলি একজোট হতেই পারবে না। চতুর্থ প্রশ্ন ছিল, ২০১৯-এ কি মোদী আবার সরকার গড়বেন? ৬২% দেশবাসী বলেছেন, আবার নিজের মহিমায় ফিরবেন নরেন্দ্র মোদী।

সি এস ডি এস 'মুড অব দ্য নেশন' পোল করেছে, তাতে এনডিএ লোকনীতি 'মুড অব দ্য নেশন পোল' করেছিল। সেই ওপিনিয়ন পোলে এনডিএ ২০১৯-এ ২৭৪টি আসন পাবে বলে জানা গেছে। ভারতের ২৯টি রাজ্যের মধ্যে ২২টিতে আজ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার। মাত্র ৪টি রাজ্যে আছে কংগ্রেস।

'ইন্ডিয়া কা ডিএনএ কনক্লেভ ২০১৯' অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, অবশ্যই ৩০০ আসনের বেশি পাবে বিজেপি ও তার জোট সঙ্গীরা। জাভড়েকর বলেন, ভারতের মানুষ বিজেপির সঙ্গে আছেন। বিজেপি মানুষের জন্য কাজ করছে। এই চার বছরে একজন মন্ত্রীর নামেও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেনি। গত ২১ জুন অর্থ, কয়লা ও রেল মন্ত্রী পীযুষ গোয়েলের মুখেও শোনা গেল এরই প্রত্যয়, অবশ্যই তিনশোর বেশি আসন পাবে বিজেপি জোট।

ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুঠো পেলেও আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে, তেমন অবস্থা কংগ্রেসের। এক ছাতার তলায় অস্তিত্ব বাঁচাতে আর ক্ষমতা লোভে একত্রিত হয়েছেন অনেকে। বিহারে মোট ৪০টি লোকসভা আসন, সেখান থেকে মহাগট বন্ধনে এসেছেন লালুপ্রসাদ যাদব। ৯০০ কোটি টাকার পশুখাদ্য মামলাতে কিছুদিন আগেও তিনি জেলের ভিতর ছিলেন। উত্তরপ্রদেশের লোকসভা আসন ৮০টি। সেখানে মহাগট বন্ধনের শরিক কুমারী মায়াবতী। ২০১৭ সালের এক রিপোর্ট অনুসারে তাঁর ভাই আনন্দ কুমার সাত বছরে ১৮ হাজার শতাংশ মুনাফা করেছেন। মায়াবতীর দুর্নীতি সর্বজন বিদিত। ২০১২ সালের কংগ্রেস সরকারের সময়ই সিবিআই তাঁকে দুর্নীতির দায়ে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। অন্ধ্রপ্রদেশে লোকসভা আসন ২৫টি। সেখান থেকে মহাগট বন্ধন সামলাবেন চন্দ্রবাবু নাইডু। এবছরই মে মাসে কংগ্রেসের রাজ্য সভার সাংসদ ডি বিজয়সাই রেড্ডি চন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি ও হাওলার অভিযোগ এনেছেন।

সেই সঙ্গে অবশ্যই আছেন পশ্চিমবঙ্গের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সারদা ও নারদার দুর্নীতিতে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বা তাপস পালের মতো সাংসদ রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তদন্তের ভিত্তিতে বহুদিন জেলে ছিলেন। অসৎ উপায়ে টাকা নেওয়ার জন্য এই দল আজ সর্বজনবিদিত। তাই দলের নেতাদের অবস্থাটা দু'কানকাটা অপরাধীর মতো, যারা রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটতে পারে। আর পঞ্চায়েত নির্বাচনে জালিয়াতির জন্য মমতা সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা ভর্ৎসিত হওয়ায় এখন তাদের দুটি কানই নেই।

২০১৯-এর লোকসভা ভোট বিশেষ গুত্বপূর্ণ যে, দেশ এখন নেহরুর মতো নেতাদের অধীনে নেই। অটলবিহারী বাজপেয়ীর পরে দেশবাসী নরেন্দ্র মোদীর মতো দেশভক্ত রাষ্ট্রনেতা পেয়েছে। তাঁর লক্ষ্য রয়েছে ভারতকে আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসানো। তাকে বিফল করার জন্য সদা সর্বদা রয়েছে বিরোধী পক্ষ। তাই ২০১৯ সালের ভোট হচ্ছে ধর্মযুদ্ধ। এই যুদ্ধ ধর্মের সঙ্গে অধর্মের, দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে দেশবিরোধীদের। পশ্চিমবঙ্গে খাগড়াগড় ও কালিয়াচকের মতো ঘটনা আর ঘটবে না। মানুষ সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে। ২০১৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে লড়াইটা সেইখানে। বিগত কয়েক মাসে বীরগতি পেয়েছে অজিত মুর্মুর মতো ২৪ জন রাজনৈতিক কর্মী। সেই রক্তে ভেজা মাটির তিলক আজ সবার কপালে। ২০১৯-এর ডাক— পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতেই হবে, জিহাদের হাতথেকে, দুর্নীতির হাতথেকে, রাজনৈতিক হিংসা ও একনায়কতন্ত্রের মহাবিপদ থেকে।

# শ্রদ্ধেয় অটলজী
## কিছু স্মৃতি, কিছু কথা

**বিজয় আঢ্য**

অটলবিহারী বাজপেয়ী চলে গেলেন। পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী, কবি, রাষ্ট্রনায়ক, সর্বোপরি একজন সুভদ্র মানুষ। অগণিত মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর প্রয়াণে দেশ-বিদেশের বহু বিশিষ্ট জন অন্তরের বেদনা জানিয়ে শোক প্রকাশ করেছেন। আমাদের মতো সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক, বহুদিন ধরেই যারা তাঁকে সঙ্ঘেরই একজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ অধিকারী হিসেবে দেখেছি, তারা সবাই আত্মীয় বিয়োগের বেদনা অনুভব করছি। তাঁকে প্রথম দেখার সুযোগ হয়েছিল কলকাতায় ২৬নং বিধান সরণির সঙ্ঘ কার্যালয়ে। তখন তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা। সকাল ১০টা নাগাদ তিনি এসেছিলেন। তৎকালীন প্রান্ত সঙ্ঘচালক অধ্যাপক অমল কুমার বসু অটলজীকে স্বাগত জানিয়ে হলঘরে নিয়ে এসে বসালেন। অটলজীর সঙ্গে অমলদার বহু দিনের সম্পর্ক। দু'জনেই মধ্যপ্রদেশের স্বয়ংসেবক। আমরা দশ-বারো জন স্বয়ংসেবক মহা- উৎসাহে তাঁকে ঘিরে বসলাম। ধুতি পাঞ্জাবি পরা একটু ভারী চেহারার মানুষ— খবরের কাগজে যেমন দেখি আর কী। ট্রাম লাইনের দিকে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। এক সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় হাতপাখাটা টেনে নিয়ে নিজেই বাতাস করছিলেন। চায়ের সঙ্গে গল্প চলছিল। বেশিরভাগ সময় তিনিই কথা বলছিলেন। আমরা গভীর মনোযোগের সঙ্গে তা শুনছিলাম। এরই মধ্যে আমাদের একজন(অশোক নন্দী) হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল— আচ্ছা, বিজেপি হিন্দু রাষ্ট্রের কথা বলে না কেন? অটলজী যেমন হেসে হেসে কথা বলছিলেন তেমনই ভাবেই বললেন, ''আমাদের উদ্দেশ্য একই। ক্ষেত্র অনুসারে ভাষার প্রয়োগ করি। আমরা তাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মতোই ভাষা ব্যবহার করি।'' তা সেদিন ঘণ্টাখানেক ছিলেন। যখন তিনি বেরিয়ে গাড়িতে উঠছিলেন তখন আশেপাশের মানুষজন উৎসুক চোখে তাঁকে দেখছিল। তারা বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করেছিল— বাজপেয়ীজী? বাজপেয়ীজী এসেছিলেন?

সেটা ১৯৮৪ সাল। স্বস্তিকায় তখনও যোগ দিইনি। কিন্তু যেতে হবে এটা জেনেছি। দমদম গোরক্ষনাথ মঠে তখন প্রচারকদের বৈঠক চলছিল। বলা হলো বিভাগ প্রচারকদের কেশব ভবনের ভিত পূজায় যেতে হবে। কেশব ভবনে ভিতপূজা বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন যাই বলুন না কেন তা তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক পূজনীয় বালাসাহেব দেওরসজীর হাত দিয়েই হয়েছিল। আর সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অটলজীও। সে সময়ে পাশের জয়সোয়াল ভবনে একটা চা-পানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে অটলজীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন প্রান্ত কার্যবাহ সুনীলবরণ মুখার্জিও ছিলেন। আমার বেশ মনে পড়ছে, অটলজী একটা ফতুয়া গায়ে দিয়েই সেই চা-পানের আসরে এসেছিলেন।

১৯৯৪ সালের কথা। শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের আমন্ত্রণে অটলজী কলকাতাতে এসেছেন। মহাজাতি সদনের প্রেক্ষাগৃহে তিনি স্বরচিত কবিতা পাঠ করবেন। সেসময় সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক রজ্জুভাইয়াও কলকাতায় ছিলেন। সেদিনের সন্ধ্যায় সেই অনুষ্ঠানে তিনি শ্রোতার আসনে বসেছিলেন। ছিলেন বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, যুগলকিশোর জৈথলিয়া, গোবিন্দাচার্য প্রমুখ বিজেপি নেতাও। অটলজী এক একটি কবিতা পাঠ করছেন তাঁর অনবদ্য ভঙ্গিতে। ১৯৮৮ সালে নভেম্বর মাসে মুম্বইয়ের হাসপাতালে শুয়ে হাঁটুর অপারেশনের আগে ভাবতে ভাবতে যে কবিতাটি লিখেছিলেন--

''ঠন গয়ী!
মওত সে ঠন গয়ী!
জুঝনে কা মেরা কোঈ ইরাদা ন থা,
মোড় পর মিলেঙ্গে ইসকা ওয়াদা ন থা,
রাস্তা রোক কর ওয়হ খড়ী হো গয়ী,
এয়োঁ লগা জিন্দেগী সে বড়া হো গয়ী।
মওত কী উম্র কেয়া? দো পল ভী নহীঁ
জিন্দেগী সিলসিলা, আজকল কী নহীঁ,
ম্যাঁয় জী ভর জিয়া, ম্যাঁয় মন সে মঁরু,
লওট কর আঁউঙ্গা, কুছ সে কিঁউ ডঁরু।।
(মওত সে ঠন গয়ী)

( মৃত্যুর সঙ্গেই জুড়ে গিয়েছি। রাস্তার কোনও এক মোড়ে মৃত্যুর সঙ্গে তার দেখা হবে— এমন কোনও কথা ছিল না। মনে হলো জীবনের থেকে মৃত্যু বড় হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর বয়স কত? এক মুহূর্তে সে জীবনের থেকেও বড়। জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক বহু দিনের। আমি প্রাণ ভরে বেঁচেছি, এবার প্রাণ ভরে মরব। ফিরে আসবো। মৃত্যুকে কেন ভয় পাবো?) --এমন করে একটার পর একটা কবিতা পাঠ করে চলেছেন। মাঝে মাঝে একটু জল খাচ্ছেন। অনুষ্ঠানটি প্রায় ঘণ্টাখানেক চলেছিল।

১৯৯৮ সালে হিন্দি পাঞ্চজন্য পত্রিকার ৫০বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে স্বস্তিকার পক্ষ থেকে দিল্লি গিয়েছিলাম। দিল্লির এক অডিটোরিয়ামে সেই অনুষ্ঠান হয়েছিল। অটলজী তখন দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। পাঞ্চজন্যের তৎকালীন সম্পাদক তরুণ বিজয়ের উদ্যোগে বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে সেই অনুষ্ঠান হয়েছিল। প্রজেক্টরের মাধ্যমে দেখানো হয়েছিল

পাঞ্চজন্যের ৫০ বছরের পথ চলার ইতিহাস। বিশেষ করে এই উপলক্ষ্যে আমরা সম্পাদকরা প্রধানমন্ত্রী অটলজী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আদবানীজীর বাড়িতে পর পর দু'দিন আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। অটলজীর ৬ নং কৃষ্ণমেনন রোডের বাড়িতে সিকিউরিটি চেকিং পেরিয়ে ঠিক রাত আটটায় পৌঁছেছিলাম। সেসময় অটলজীকে প্রণাম করারও সৌভাগ্য হয়েছিল। সঙ্ঘের তৎকালীন সরকার্যবাহ সুদর্শনজীও সেখানে ছিলেন। ছিলেন রেলমন্ত্রী নীতীশ কুমারজী। এতদিন এসবের কথা শুনে এসেছি, এখন প্রত্যক্ষ করছি।

ভোজটা তখন গৌণ হয়ে গিয়েছিল। এত ভিআইপি-দের মধ্যে নিজেকে দেখে আনন্দ ও গর্ব দুই-ই হচ্ছিল। কেননা ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ১৯৫০ সালের ১৬ মার্চ ডাঃ বিধান রায়কে দেওয়া এক চিঠিতে স্বস্তিকাকে 'worst pepers'-এর অন্যতম বলে চিহ্নিত করেছিলেন। এখন ভারতের আর এক প্রধানমন্ত্রী সেই স্বস্তিকাই এক সম্পাদককে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন— এ এক অনাস্বাদিত অনুভূতি। অটলজী ও সুদর্শনজীকে ঘিরে জটলা, ক্যামেরার ঝলকানি। পরে এই অনুষ্ঠানের একটা ছবি তরুণজী পাঠিয়েছিলেন।

অটলজীকে কাছে থেকে দেখার আরও একবার সুযোগ হয়েছিল। তিনি তখন তৃতীয়বারের প্রধানমন্ত্রী। তপন শিকদার তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। কলকাতায় রাজভবনে চা-চক্র ছিল। সেখানে যাওয়ার আমন্ত্রণ ছিল। পরিচয়ের পালা এলে তপনদা আমার নাম করে বলেছিলেন— ইনি স্বস্তিকার সম্পাদক। অটলজী শুনে বলেছিলেন, তিনি স্বস্তিকাকে জানেন। একেও দেখেছি...। তাঁর সঙ্গে হাত মেলাতে গেলে সিকিউরিটিদের তৎপরতায় তা আর হয়ে ওঠেনি।

এরপরও দু'বার দেখা হয়েছে, তবে দূর থেকে। একবার ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে। আর একবার ব্রিগেডের জনসভায়। সেসময় দলের সভাপতি ছিলেন আদবানীজী। তাঁর শেষে বলার কথা। কিন্তু তিনি বললেন,' আমি আগে বলবো, কেননা অটলজী বলার পর আমার বক্তৃতা শোনার কারও ধৈর্য থাকবে না।' জনতার মধ্যে হাসির রোল উঠল।

সালটা ১৯৯৪-এর আশেপাশে হবে। সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকদের বৈঠকে যোগ দিতে নাগপুর গিয়েছি। সেই সময় সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসের সহস্র চন্দ্রদর্শন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সারাদিন ধরে রেশিমবাগ ময়দানে ডাক্তারজীর সমাধি মন্দিরের পাশে বৌদ্ধিক কক্ষে(এখন নেই) হোম-যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে বালাসাহেবকে শ্রদ্ধা জানাতে অটলজী নাগপুরে এসেছিলেন। বালাসাহেবের আপ্তসহায়ক ছিলেন শ্রীকান্ত যোশী। বালাসাহেব তখন প্রচণ্ড ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত। কথা বলতে পারতেন না। শুধু দেখেন। শ্রীকান্তজী তাঁর মনের ভাব বুঝে অন্যদের বোঝান। এক্ষেত্রেও সেরকম হলো। তিনি বালাসাহেবের কানের কাছে জোর গলায় অটলজীর আসার কথা বললেন। অটলজী বালাসাহেবকে প্রণাম করলেন। বালাসাহেব ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে সব দেখছেন, হয়তো অনুভবও করছেন। কিন্তু তার কোনও বহিঃপ্রকাশ নেই। সে এক করুণ দৃশ্য। সে সময় খুব কাছে থেকে দুই মনীষীর সাক্ষাৎকারের দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল।

ঘটনা হলো, লেখকের মতো অটলজীর সান্নিধ্যলাভের সুযোগ অনেকেরই কমবেশি হয়েছে। সেইসব স্মৃতি থেকে কিছু কথা-পুষ্প চয়ন করে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি। প্রণাম অটলজী প্রণাম।

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে অটলজীর সঙ্গে লেখক ও অন্যান্য আমন্ত্রিতরা।

# চিঠিপত্র

## সভ্যতার সংকট নিরসনে একাত্ম মানবদর্শন

আজকের সমস্যা জর্জরিত অশান্ত পৃথিবীতে মানুষ যখন সভ্যতার সংকটের মুখোমুখি, নীতিহীনতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ে হারিয়ে যেতে বসেছে, সেই সময় 'একাত্ম মানবদর্শন'ই মানুষের মুক্তির পথ।

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ১৯৬৫ সালে গোয়ালিয়রে ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিনিধি সভার অধিবেশনে একাত্ম মানবদর্শন আলোচনার জন্যে উত্থাপন করেন, সেই সঙ্গে বিভিন্ন দিকগুলো ব্যাখ্যা করেন। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি যখন অমানিশার অন্ধকারে মুখ লুকাচ্ছে, তখনই প্রয়োজন হয়ে পড়ছে মানুষের সামনে একাত্ম মানবদর্শনের উপযোগিতার কথা তুলে ধরার।

পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ছিলেন তথাগত রায়। বর্তমানে তিনি ত্রিপুরার রাজ্যপাল পদে আসীন রয়েছেন। ওনার সভাপতি থাকাকালীন সময়ে ইংরেজিতে লেখা 'Intrigal Humanism' বইটি বাংলায় অনুবাদ হয়ে 'একাত্ম মানবদর্শন' প্রচারের আলোতে আসে। বাংলার মানুষ জানতে পারলেন জাতীয়তাবোধের ভিত্তিতে গড়ে উঠা এক দর্শনের কথা।

**—বিমল চন্দ্র পাল,**
শ্যামাপ্রসাদ পল্লী, কোচবিহার।

## মমতা ব্যানার্জি কেন এন আর সি নিয়ে সরব?

কয়েকদিন পূর্বে অসমে খসড়া নাগরিকপঞ্জি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে গৃহযুদ্ধের হুমকি দিয়ে কথা বলেছেন তাতে মনে হয় তার কণ্ঠ থেকে জিন্নার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। অখণ্ড বাংলার হিন্দু বাঙালি জনগণ ভালভাবেই জানে যে, ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লিগের সর্বোচ্চ নেতা জিন্নার নির্দেশে কলকাতা, লাহোর ও নোয়াখালিতে প্রকাশ্যে হিন্দু নিধনযজ্ঞ শুরু হয়। প্রায় এক কোটি হিন্দু জনগণ তাদের পৈতৃক ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য হয় এবং এ রাজ্যে ও অন্যত্র এসে প্রাণ বাঁচায়। বর্বর ব্রিটিশ সরকারের গোপন প্রশ্রয় না থাকলে কিছু জিহাদি মুসলমান এইরূপ জঘন্য কাজে লিপ্ত হতে পারতো না। কারণ শয়তান ব্রিটিশ সরকার, জিন্না ও নেহরু মিলিতভাবে দেশভাগের ষড়যন্ত্র করেছিল। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির তীব্র আন্দোলনের ফলে পূর্ব পঞ্জাব, অসমের একটি অংশ ও পশ্চিমবঙ্গ ভারতে যুক্ত হয়। আমার জানতে ইচ্ছা করে যে, এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন সর্বপ্রথম অসম নাগরিকপঞ্জির খসড়া প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রে রে করে আসরে নেমে পড়েছেন ও প্রকাশ্যে বললেন যে, অসমে ও দেশের অন্য স্থানে গৃহযুদ্ধ আসন্ন। একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যদি এই ভাষায় কথা বলেন তবে এ রাজ্যে জরুরি অবস্থা জারি করা এই মুহূর্তেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যে কোনো দেশের ক্ষেত্রেই এটা প্রয়োজন বা প্রযোজ্য। দেশের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে দেশের কিছু কালিদাসমার্কা নেতা বা নেত্রী আর কতদিন ছেলেখেলা করবেন? মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের ভোটে যাদের প্রতিটি নির্বাচনে জয়লাভ করতে হয় তাদের নিকট থেকে আইন রক্ষার দায়িত্ব কেড়ে নেওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। এখনও দেশের নিরাপত্তা ও বিচার-ব্যবস্থা অটুট আছে। একটা সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক দেশের একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে ভাষায় কথা বলেছেন যে-কোনো সময় দাঙ্গা বা গৃহযুদ্ধ লেগে যেতে পারে। সেজন্য আগাম সতর্কতা হিসাবে এ রাজ্যে জরুরি অবস্থা জারি করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

**—বিপ্লব বসু,**
কলকাতা-৩৬।

## ভারত ইসলামি দেশ হওয়ার পথে!

জনসংখ্যা অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বাড়লে তা যে রাষ্ট্রের ভয়ানক সমস্যা সৃষ্টি করে তা সর্বসম্মত। যে সকল দেশের মধ্যে জনসংখ্যাবৃদ্ধি বিরাট সমস্যা তার মধ্যে চীন ভারত ও বাংলাদেশ প্রধান। কিন্তু সমাধানের যে পথ— জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, সে ব্যাপারে সেই দেশগুলির পরিস্থিতি এক নয়। চীন ও বাংলাদেশের পক্ষে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অনুসরণে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ভারতে আছে।

চীনে গণতন্ত্র নেই। চীনে মুসলমানরা কঠোর নিয়ন্ত্রণে আছে। যা ভারতে অনুপস্থিত। অতএব চীনে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি নেই। এবং ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর সংখ্যা পরিবর্তনজনিত কোনো সমস্যা নেই।

বাংলাদেশে গণতন্ত্র থাকলেও দেশটি ইসলামিক স্টেট। শরিয়তি আইন বিরুদ্ধ কোনো আইন সেখানে অসম্ভব। সর্বোপরি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাদি জনসংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। মুসলমানদের মতো তাঁরা আগ্রাসী ও জঙ্গি নয়। তাঁরা কোনো ধর্মীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কোনোদিন করেনি এবং করবেও না। বাংলাদেশে অমুসলমান রাষ্ট্র প্রধান হওয়ার কোনো সম্ভাবনা সংবিধান সম্মত নয়। সুতরাং জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কোনোভাবেই সেখানে মুসলমান প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ করবে না।

ভারত হিন্দুপ্রধান দেশ হলেও এখানে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। হিন্দুরা প্রধানত অসাম্প্রদায়িক, নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় (আসলে ভীরু)। জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হিন্দুরা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করলেও মুসলমান জনগোষ্ঠী ধর্মীয় অনুশাসনের অজুহাতে ও ধর্মীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রধানত তা করে না। শরিয়ত বলে একাধিক বিয়ে করার আইন তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একজন মুসলমান একইকালে চারজন স্ত্রী এবং যখন তখন তালাক দিয়ে চারটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেও অজস্র বিবি গ্রহণ দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত সন্তান

উৎপাদন মারফত জ্যামিতিক হারে পয়দা করছে, যা গণতান্ত্রিক ভাবেই দেশে ইসলামিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে পারে। ফলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর অবস্থা কী হবে তা সহজেই অনুমেয়। পৃথিবীর ইসলাম শাসিত দেশগুলি প্রমাণ করে অপর ধর্ম সংস্কৃতি জাতীয়তা ধ্বংস করে দেওয়া হয়, যা গণতন্ত্রের প্রতিকূল। অতএব সেই ভয়াবহ ভবিষ্যৎ ঠেকানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা এখনই একান্ত প্রয়োজন।

**—কমলাকান্ত বণিক,**
দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

# উনিশে বিরোধী নেতা কে?

উনিশের লোকসভা ভোট আসন্ন। দেশের বিরোধী দলগুলি বর্তমান শাসক দলকে পরাজিত করতে মাঠে নেমেছে। কিন্তু এই বিরোধীদের নেতা কে তা আজও দেশের মানুষ বুঝতে পারেনি। অনেকে বলছেন আমরা সবাই রাজা অর্থাৎ আগে তো বিজেপিকে হারাও তারপর দেখা যাবে। লোকসভা ভোট কিন্তু শক্তিশালী নেতা দেখে হয়। যেটা শাসক দলেরই আছে। আর বিরোধীদের এজেন্ডা কী। এখনো পর্যন্ত যেটা মনে হচ্ছে সেটা হলো একবার প্রধানমন্ত্রী হওয়া। তাই তো কোনো কোনো দলের নেতা মন্ত্রীদের বলতে শোনা যাচ্ছে বিয়াল্লিশটিই চাই, তাহলে হয়তো প্রধানমন্ত্রী হওয়া যাবে। সম্প্রতি কিছু উপনির্বাচনে বিরোধীরা একটা ভালো ফল করায় বিরোধীদের কেউ কেউ ভাবতে শুরু করেছেন যে কেন্দ্রে এইবার পরিবর্তন হবেই, কিন্তু তার আগের বিধান সভা ভোটের ফলগুলি তাঁরাই ভুলেই গিয়েছেন।

হিন্দি বলয়ের রাজ্যগুলির মধ্যে বিহার, উত্তরপ্রদেশ বাদে বাকি রাজ্যগুলিতে কংগ্রেস ছাড়া আর কোনো বিরোধী দল নেই। সেখানে বিরোধীদের তেমন সম্ভাবনা নেই। বিহারে বিজেপি-র সঙ্গে নীতীশ কুমারের শক্তিশালী জোট আর সেখানেও বিরোধীরা অনেক পিছিয়ে। আর উত্তরপ্রদেশেও দুই প্রধান বিরোধীদলের নেতা বা নেত্রী উপনির্বাচনে জোট করলেও সাধারণ নির্বাচনে কতটা করবেন তা সময়ই বলবে। আর সাধারণ নির্বাচনে ভোট শতাংশ উপনির্বাচনের তুলনায় অনেক বেশি হবে যা অনেক কিছু বদলে দেবে। রাজস্থান, গুজরাট, দিল্লি, হিমাচল প্রদেশে কোনো জোটই বিজেপিকে আটকাতে পারবে না। পঞ্জাবে শেষ বিধানসভা ভোটের থেকে বিজেপির ভোট কিছু বাড়বে। আর জম্মু-কাশ্মীরে জম্মু ও লাদাকে বিজেপিরই থাকবে। এ বার দক্ষিণের কেরলে বিজেপির হারানোর কিছু নেই। তামিলনাড়ুতে জয়ললিতার দল বিজেপির পাশেই থাকবে। কর্ণাটকে জোট হলেও বিজেপি শক্তিশালী। অন্ধ্রপ্রদেশে এই দুই আঞ্চলিক দল একসঙ্গে আসবে না। ফলে যে-কোনো একজনের হাত ধরাই যেতে পারে। তেলেঙ্গানাতে শাসক দল লোকসভা ও রাজ্যসভাতে দেখিয়েছে তারা কী চায়। আর গোয়া তো বিজেপির।

ওড়িশার শাসক দল বরাবর নিরপেক্ষ আর ওখানে কংগ্রেস তৃতীয়। পূর্ব ভারতে বিজেপি জোট আর কংগ্রেস জোটের মধ্যে বিজেপি জোট এগিয়ে।

এইবার পশ্চিমবঙ্গ। এখনকার মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী জোটের কথা বললেও তাঁর রাজ্যেই বিরোধী জোট হবে না। আর এই রাজ্যে বিজেপির মাত্র দুজন এম পি। বর্তমানে এই রাজ্যে কংগ্রেস ও বামেরা কার্যত সাইন বোর্ড। তাই বিরোধী জোটের সিংহভাগই বিজেপি পাবে। বিজেপির আসন দুই থেকে যতটাই বাড়বে পুরোটাই লাভ। তাই এইটুকু বলা যায়, সামনে ভোটে অনেকেরই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন ব্যর্থ হবে, আর এন ডি এ জোটের গতবারের থেকে বেশি আসন নিয়ে ক্ষমতায় ফেরা শুধুই সময়ের অপেক্ষা।

**—পদ্মপ্রিয় পাল,**
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

# রাহুল গান্ধীর ইফতার পার্টিতে ইয়েচুরি

মুসলমানদের রমজান মাসে ইফতার পার্টি কে আয়োজন করতে পারেন এবং কারা অংশ নিতে পারেন বিশিষ্ট মুসলমান লেখকরা তাঁদের লেখায় বিভিন্ন সময়ে তা ব্যক্ত করেছেন। কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর ডাকা ইফতার পার্টি মূলত ইউপিএ সমর্থক দলগুলোর সঙ্গে বাম তাত্ত্বিক এবং সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরিকে দেখা গেল। তিনি আবার রাহুল গান্ধীর অন্যতম উপদেষ্টা হিসাবে বিবেচিত। বাদ গেলেন বিজু জনতা দল, টি আর এস, এ ডি এম কে, জগনমোহন রেড্ডির ওয়াই আর এস যাঁরা জাতীয় রাজনীতিতে রাহুল গান্ধীকে যোগ্য ব্যক্তি বলে মনে করেন না। রাহুল গান্ধীর আমন্ত্রণে এইসব আঞ্চলিক দলের কোনো প্রধান নেতা যাননি, ছিলেন তাঁদের প্রতিনিধি। যোগ দিয়েছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী প্রতিভা পাতিল। ছিলেন প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহ ও অন্য কংগ্রেসীরা। কিন্তু দেখা যায়নি কোনো ধর্মীয় নেতাকে। উপস্থিত ছিলেন না ইউপিএ-র চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী। তা শারীরিক অসুস্থতার জন্য বা আর্চ বিশপদের ইঙ্গিতে, তা বলা কঠিন। দেখা গেল মধ্যমণি রাহুল গান্ধী। দুই পাশে প্রণব মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী প্রতিভা পাতিল। অন্যদিকে হাস্যউজ্জ্বল সীতারাম ইয়েচুরি এবং সাংসদ দীনেশ ত্রিবেদী।

রাহুল গান্ধীর শারীরিক ভাষায় এবং একধরনের প্রগলভতায় তার অপরিপক্কতার চিত্র ধরা পড়েছে বারে বারে। স্থিতধী, প্রাজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ প্রণববাবু মাঝে মাঝে কিছু কথাবার্তা বলেছেন বলে মনে হলো, নীরব ছিলেন প্রতিভা পাতিল।

রাহুল গান্ধী যা ছিলেন তাই আছেন। কিন্তু ধর্ম যাদের কাছে আফিম, কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন হলে তা প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় উন্মাদনা--- সেই মার্কসবাদী শিরোমণি কীভাবে ভুঁড়িভোজন করলেন--- তার একটা মার্কসীয় ব্যাখ্যা পাওয়া দরকার। তবে, যেহেতু রাহুল গান্ধী আয়োজন করেছেন অবশ্যই তা ধর্মনিরপেক্ষ। এতে যোগদান মার্কসবাদীদের আবশ্যিক দায়িত্ব।

**—তুষারকান্তি সরকার,**
কোচবিহার।

# কাংড়িধাম রন্ধনশৈলী রপ্ত করতে পারেন বাঙালি মায়েরাও

**সুতপা বসাক ভড়**

হিমালয়ের কোলে ছোট্ট একটি রাজ্য হিমাচল প্রদেশ। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। বছরের বেশিরভাগ সময় বরফে ঢাকা থাকে এই পাহাড়ি রাজ্যটি। এখানকার জীবনশৈলী সমতলের থেকে আলাদা হলেও অন্যান্য রাজ্যের মতো এখানেও এক বিশিষ্ট রন্ধনশৈলী গড়ে উঠেছে। কাংড়িধাম নামে তা বিশ্ববিখ্যাত। এখানকার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে কাংড়িধামের বেশ কিছু ব্যঞ্জন টিন ভর্তি হয়ে দেশ-বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে।

কাংড়িধামের রন্ধনশৈলীর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন— এটি অবশ্যই সাত্ত্বিক নিরামিষ পদ্ধতিতে অর্থাৎ পেঁয়াজ-রসুন ছাড়া তৈরি করা হয়। রান্নার প্রধান পদ হলো ভাত এবং বিভিন্ন প্রকারের ডাল। প্রথাগত ভাবে কাংড়িধাম মানে হিমাচলের পারম্পারিক নিমন্ত্রণ বাড়িতে মাটিতে বসে পাত পেতে খাওয়া। ব্যঞ্জন

প্রায় একই রকম থাকে— সুস্বাদু বাসমতী চালের ভাত, ছোলার ডাল, মুসুরি ডাল, অড়হর ডাল, কড়াইয়ের ডাল, রাজমা, কাবলিছোলা, মটর পনির, ছোলার খটাই(টক) এবং মিঠা-চাওল।

বাঙালি রসনায় একটু অপরিচিত হলেও রান্নাগুলি খুবই সুস্বাদু। উৎসব অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ পাচকরাই রান্না এবং জোগারের কাজ করে থাকেন। এরা হলুদ ধুতি ও সাদা পোশাক পরে খালি পায়ে রান্না, রান্নার জোগার এবং খাবার পরিবেশন করে। রান্না শুরু হয় আগেরদিন রাত থেকে। রান্নার জন্য নির্ধারিত স্থানে বোটিরা মাটি কেটে নালির মতো উনুন তৈরি করে। এই উনুনকে এখানে 'তিন' বলা হয়। নালির মধ্যে জ্বালানি কাঠ 'x' আকারে সাজিয়ে ৫/৬টি হাঁড়ি পর পর বসিয়ে রান্না করা হয়। অনেক সময় ধরে কম আঁচে পদগুলি রান্না করা হয়।

সুস্বাদু কাংড়িধামের স্বাদ পশ্চিমবঙ্গের ঘরে বসে সহজেই পাওয়া যেতে পারে। প্রথমে বাসমতী চাল জলে ধুয়ে ফুটন্ত জলে দিতে হবে। ভাত একটু শক্ত থাকতেই নামিয়ে ফ্যান ঝরিয়ে নিতে হবে। যে ডাল রান্না করবেন তা ২/৩ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরে হাঁড়িতে জল দিয়ে কম আঁচে বসাতে হবে। এখানে একটা ব্যাপার আছে। বসানো ডালের মধ্যেই পরিমাণ মতো তেল, নুন, হলুদ, লঙ্কা, জিরে-ধনের গুঁড়ো, আমচুর গুঁড়ো, গরম মশলা, তেজপাতা ইত্যাদি দিয়ে দিতে হবে। রান্না হয়ে গেলে রাজমা, কাবলি ছোলাতে ধনেপাতা দেওয়া হয়। এসময় ঢাকনা বন্ধ করা যাবে না। ঢাকনা বন্ধ করলে ধনেপাতার সবুজ রং চলে যাবে। ছোলার ডালে জিরে, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, জিরে গুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো, আদাগুঁড়ো দিতে হবে। কাবলি ছোলার ক্ষেত্রে আলু ও ছোলা সেদ্ধ করে নিতে হবে। কড়াইতে তেলে জিরে, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে আঁচ বন্ধ করে দিতে হবে। একটু ঠাণ্ডা হলে টকদই,নুন, হলুদ লঙ্কা মিশিয়ে আবার কম আঁচে বসিয়ে ক্রমাগত নাড়তে হবে। একটু পরে তেল ছাড়তে শুরু করলে সেদ্ধ করা ছোলা ও আলু ঢেলে সামান্য জল দিয়ে নেড়ে নিলেই তৈরি কাংড়ি কাবলি ছোলা।

মটরপনিরেও কাবলি ছোলার মতো মশলা কষিয়ে তাতে কেটে রাখা পনির, আগে সেদ্ধ করা মটর মিশিয়ে রান্না করতে হবে। উল্লেখ্য, কাংড়িধামের রান্নায় বেশি টকদই ব্যবহার করা হয়। রাজমাতে হলুদ, সরষেবাটা ও টকদই আলাদাভাবে দেওয়া হয়। তেজপাতা, হলুদ, লঙ্কাগুঁড়ো অন্যান্য ডালের মতোই দিতে হবে। পরিবেশনের আগে টাটকা ধনেপাতা দিতে হবে। অড়হর ডালে মশলার সঙ্গে পরিমাণ মতো আমচুর দিতে হবে যাতে রান্নাটি বেশ টক স্বাদের হয়। মুসুরডালে জিরে, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দেওয়ার পর হলুদ ও লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে নেড়ে নিতে হবে।

কারির জন্য প্রয়োজন বেসন ও বেশি টকদই। প্রথমে বেসনে নুন, লঙ্কা, আদাগুঁড়ো জল দিয়ে খুব ভালো ভাবে ফেটাতে হবে। বেসন ফুলে উঠলে ছাঁকা তেলে বড়ার আকারে ভেজে তুলতে হবে। ওই তেলেই সম মাপে জিরে, মেথি, শুকনো লঙ্কা ও কারিপাতা ফোড়ন দিতে হবে। বেশ সুগন্ধ ছাড়লে আঁচ বন্ধ করে বেসনে টকদই, জল, নুন, হলুদের মিশ্রণ তৈরি করতে হবে। মিশ্রণটি এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যাতে দই-বেসন-জল আলাদা না চেনা যায়। মিশ্রণটি ঢেলে কম আঁচে ক্রমাগত নাড়তে হবে। ফুটে উঠলে বড়াগুলি ঢেলে আরও মিনিট দশেক কম আঁচে রান্না করলেই তৈরি কারি। গরম গরম কারি-ভাত অত্যন্ত সুস্বাদু খাদ্য। কালো ছোলার খটাই(টক) রান্নার পদ্ধতি একটু আলাদা। কাগজি আখরোট খোসাসুদ্ধ আগুনে পুড়িয়ে গুঁড়ো করে জলে গুলে পাতলা করে তাতে নুন, হলুদ, লঙ্কা, পরিমাণ মতো আমচুর (খেতে যেন বেশ টক হয়) এবং আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা কালো ছোলা মিশিয়ে আঁচে বসিয়ে ফুটিয়ে নিলেই তৈরি খটাই।

অন্তিম পদ মিঠা-চাওল। বাসমতী চাল শক্ত করে সেদ্ধ করে গাওয়া ঘিয়ে ভেজে নিয়ে তাতে কেশর,বাদাম, কাজু, কিশমিশ, কোড়ানো নারকেল, এলাচগুঁড়ো, খোয়া ক্ষীর মিশিয়ে উপরে গাঢ় চিনির রস ঢেলে ভালো করে নেড়ে নিলেই তৈরি মিঠা-চাওল।

প্রতিদিন একই ধরনের রান্নার মধ্যে বৈচিত্র্য আনতে কাংড়িধামের জুড়ি মেলা ভার। নিরামিষ হলেও এই পদগুলি পরিবারের সবার রসনা অবশ্যই তৃপ্ত করবে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের রান্নাকে পরিবারের সবার পাতে দেওয়ার দায়িত্ব মহিলাদেরই।

(যোগাযোগ -৯৮৮২৭০১৪৮৯)

# পঞ্চাশের পর ভালো থাকার উপায়

**ডাঃ প্রকাশ মল্লিক**

চিকিৎসক জীবনে দেখেছি, চল্লিশ বছরের পর থেকে বার্ধক্যজনিত রোগ শুরু হয়। এই সময় যদি একটু সচেতন হওয়া যায় তবে সত্তর বছর বয়সেও অনেকে মানসিক ও শারীরিক ভাবে সক্ষম থাকেন। মোটামুটি ভাবে পঞ্চাশের পর অনেকেই কাবু হয়ে যান। পঞ্চাশের পর মানুষের মানসিক ও দৈহিক রোগের প্রকোপ তুলনামূলক ভাবে বেশি হয়। অপ্রিয় সত্য হলো, এই বয়সটা অনেক কিছু হারানোর বয়স। এই সময় দেহে লবণ জাতীয় পদার্থের ঘাটতি হয়। তার ফলে ত্বক ক্রমশ অমসৃণ হয়ে যায়। দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ফুসফুস, কিডনি,হার্ট, ব্রেন ইত্যাদির কার্যক্ষমতা ক্রমশ কমে যায়। এই সময় স্মৃতিশক্তি কমে আসে এবং মস্তিষ্কের ওজন ক্রমশ কমতে থকে। এর ফলে মাথা ধরা , অনিদ্রা ইত্যাদি সমস্যা প্রকট হয়। বয়স্কদের অন্যতম দুঃখজনক ও কষ্টদায়ক সমস্যার নাম ডিমেনসিয়া বা স্মৃতিভ্রংশতা। এছাড়া উচ্চ রক্তচাপও এসময়ের একটি সমস্য।

জীবনযাত্রায় স্ট্রেস, টেনশন এসব সমস্যার একটি বড়ো কারণ। আবার উচ্চ রক্তচাপের অন্যতম কারণ স্থূলতা। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স হলেই খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এসময় রান্নায় তেল, নুন কম খেতে হবে। মদ্যপান ও ধূমপান একেবরেই বন্ধ করতে হবে। লো ব্লাড প্রেসার হয় বিভিন্ন কারণে। এর ফলে হার্ট, ব্রেন, কিডনিতে অক্সিজেন ও পুষ্টির সরবরাহ কম হয়। নিম্ন রক্তচাপে দুর্বল লাগা, উঠতে বসতে মাথা ঘোরা,মনোযোগের অভাব, হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়া, বার বার জল পিপাসা পাওয়া ইত্যাদি হতে পারে। এর প্রতিরোধে নুন চিনির জল খেতে হবে। কারণ নুন দেহে জল ধরে রাখে। পাশাপাশি প্রোটিন ও আয়রন সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে।

আধুনিক সভ্যতার কারণে ডায়াবেটিসে শরীরে ইনসুলিনের কর্মক্ষমতা কমে ও রক্তে সুগারের পরিমাণ বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে নিয়মিত মর্নিংওয়াকের পাশাপাশি ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। বাদ দিতে হবে ফাস্ট ফুড। নিতে হবে হেলদি ডায়েট। চিনি, গুড়, মধুর মতো সিম্পল কার্বোহাইড্রেট এড়িয়ে চলতে হবে। জোর দিতে হবে ফল খাওয়ার দিকে। ব্যায়াম খুবই জরুরি। ওজন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতে হবে। ৩ মাস অন্তর ব্লাড লিপিড প্রোফাইল চেক করাতে হবে। কারণ যাদের রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেশি তাদের হাই কোলস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের সমস্যার প্রবণতা থাকে। ব্লাড প্রেসার ও ব্লাড সুগারেরও সমস্যা থাকতে পারে। এসময় বিভিন্ন ধরনের ব্যথায় আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। অস্টিও আর্থ্রইটিসে আক্রান্ত হয় হাঁটু, হিপ জয়েন্ট। অসহ্য ব্যথা এবং হাঁটুর উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাওয়া এই অসুখের প্রাথমিক লক্ষণ। হাঁটু ভাঁজ করতে অস্বস্তি ও অনেক সময় হাঁটুতে জল জমার প্রবণতা দেখা যায়। অন্যদিকে অস্টিওপোরোসিসে অস্থিকলার ক্ষয়জনিত কারণে হাড়ের ঘনত্ব কমতে থাকে এবং হাড় ক্ষয়ে ছিদ্রবহুল ও ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদি স্টেরয়েড চিকিৎসা, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, ভেজাল খাবার পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি কারণেও হাড়ের ভঙ্গুরতা দেখা দিতে পারে। এর আগাম সতর্কতা হিসেবে রোজকার খাদ্যতালিকায় পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার থাকা খুবই জরুরি। পাশাপাশি কিছু শরীরচর্চা যেমন সাঁতার, জগিং,সাইক্লিং করতে পারলে খুবই ভালো।

এই রোগগুলি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী হোমিওপ্যাথি ওষুধের দ্বারা নিরাময় সম্ভব। উচ্চ রক্তচাপ যদি মানসিক কারণে হয় তবে স্ট্যাফিসেগ্রিয়া, ইগনেশিয়া, ন্যাটমিউর, স্প্যাটিয়াম করপাই, রাউলফিয়া,গ্লোনিয়ন প্রভৃতি ওষুধ ব্যবহার করা যায়। নিম্ন রক্তচাপের ক্ষেত্রে ভিসকাম অ্যালবাম, চাইনা, অ্যাভেলা-স্যাট কার্যকরী। ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে লক্ষণ অনুযায়ী অ্যাসিড ফস, ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাম, ল্যাকটিক অ্যাসিড, আর্স ব্রোমাইড, রাস অ্যারোমেট্রিকাস খেলে সুফল পাওয়া যায়। মনে রাখতে হবে, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা যায়, নিরাময় করা যায় না।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই এসময় মনকে সতেজ রাখতে হবে। নেতিবাচক ভাবনা মনে স্থান দেওয়া চলবে না। প্রদিন ৩০ মিনিট জোরে জোরে হাঁটুন। সারা দিন নিজেকে কাজে ব্যস্ত রাখুন। ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমান। ভালো ভালো বই পড়ুন। সমাজ সেবা করুন, মানুষের পাশে দাঁড়ান। ছোটোদের সঙ্গে সময় কাটান। এতে আপনাকে ভালো থাকতে সাহায্য করবে। মন যদি সুস্থ থাকে তবে শরীরও থাকবে চনমনে, তরতাজা। বয়সকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আপনিও পারবেন আত্মবিশ্বাসী ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর থাকতে। ▮

# সমীক্ষা বলছে উনিশে আবার মোদী

**অভীক সরকার**

উনিশে নরেন্দ্র মোদী, না কি রাহুল? বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সমীক্ষা কী বলছে? না, চিন্তার কোনও কারণ নেই। এখনও পর্যন্ত যতগুলি সমীক্ষা হয়েছে, প্রত্যেকটিতেই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন নরেন্দ্র মোদী।

প্রথমেই ধরা যাক টাইমস অব ইন্ডিয়ার করা সমীক্ষার কথা। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাকে পছন্দ? নরেন্দ্র মোদী না রাহুল গান্ধী? ৭১ শতাংশ মানুষ বলেছেন, নরেন্দ্র মোদী। ২১ শতাংশ বলেছেন রাহুল গান্ধী। সব থেকে বড়ো কথা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়েছেন ১ শতাংশেরও কম ভোট। সি-ভোটার দীর্ঘকাল ধরে নির্বাচনী সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করে আসছে। এবারও দশ হাজার মানুষের ওপর সমীক্ষা করেছে। তাদের মধ্যে ৬৬ শতাংশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীকে পছন্দ। রাহুল গান্ধী পেয়েছেন ২৮ শতাংশ ভোট। সমীক্ষকেরা জানিয়েছেন, ২০১৫ সালে সি-ভোটার কৃত সমীক্ষায় মোদী পেয়েছিলেন ৬২.৭০ শতাংশ ভোট। এবার বেড়ে হয়েছে ৬৬ শতাংশ। অন্যদিকে রাহুল গান্ধী ২০১৫ সালে পেয়েছিলেন ৩২ শতাংশ ভোট, এবার সেটি কমে হয়েছে ২৮ শতাংশ। সোনিয়া গান্ধী এবং মনমোহন সিংহ পেয়েছেন যথাক্রমে ৪.৪০ শতাংশ এবং ৪.৩০ শতাংশ ভোট। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের অবস্থা বেশ শোচনীয়। সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাকে পছন্দ করেছেন ১.৬০ শতাংশ মানুষ।

সমীক্ষায় তিনটি ইস্যুকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছেন অংশগ্রহণকারীরা। তাদের অভিমত, বর্তমান সরকার দুর্নীতি এবং মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে ভালো কাজ করেছে। যার ফল— ২০১৩ সালের জুলাই মাসে ২৪ শতাংশ মানুষ মনে করতেন দুর্নীতিই হলো দেশের সব থেকে জ্বলন্ত সমস্যা। কিন্তু ২০১৮ সালে মাত্র ১১ শতাংশ মানুষ এই সমস্যাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন। ২০১৩ সালে মূল্যবৃদ্ধিকে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বলে মনে করতেন ২৫ শতাংশ মানুষ। কিন্তু ২০১৮-তে তা কমে হয়েছে মাত্র ৮ শতাংশ। সমীক্ষকদের অভিমত, এর অর্থ জিনিসপত্রের দাম বেঁধে রাখতে মোদী সরকার সফল হয়েছে। যার ফলেই এই হ্রাস। তবে একটা বিষয়ে মোদী সরকারের ভাবনাচিন্তা করা প্রয়োজন। ২০১৩ সালে ১৩ শতাংশ মানুষ মনে করতেন কর্মসংস্থানের অভাব দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ২০১৮-তে অনুরূপ ভাবনাচিন্তা করা মানুষের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২০ শতাংশ।

**সব দিক থেকেই এনডিএ জোট এগিয়ে। বাংলা সংবাদ মাধ্যম রাহুল গান্ধীকে আগামী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা প্রায় করেই ফেলেছে। কিন্তু আগামী লোকসভায় জিতবে এনডিএ। নরেন্দ্র মোদী আবার প্রধানমন্ত্রী হবেন।**

শুধু টাইমস বা সি-ভোটার নয়। গত তিন বছরে বেশ কয়েকটি সমীক্ষা হয়েছে। প্রতিটি সমীক্ষাতেই এনডিএ-কে সম্ভাব্য বিজয়ী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ২০১৫র আগস্টে ইন্ডিয়া টুডে একটা সমীক্ষা করেছিল। তাতে এন ডি এ পেয়েছিল ২৮৮ এবং ইউপিএ ৮১টি আসন। ২০১৬ সালে ওই একই সংস্থার সমীক্ষায় এনডিএ পেয়েছিল ২৮৬ এবং ইউপিএ পেয়েছিল ১১০টি আসন। এরপর ২০১৭। সেবার এনডিএ ৩৭০ এবং ইউপিএ ৬০। ২০১৮র জানুয়ারিতে এবিপি নিউজ-সিএসডিএস কৃত সমীক্ষায় এনডিএ ৩০১ এবং ইউপিএ ১২৭। ইন্ডিয়া টুডে-কৃত সমীক্ষায় এনডিএ ৩০৯ এবং ইউপিএ ১০২। রিপাবলিক টিভি সি ভোটার কৃত সমীক্ষায় এনডিএ ৩৩৫ এবং ইউপিএ ৮৯। এবিপি নিউজ-সিএসডিএস কৃত সমীক্ষায় (মে, ২০১৮) এনডিএ ২৭৪ এবং ইউপিএ ১৬৪। ইন্ডিয়া টুডে কারভি কৃত সমীক্ষায় এনডিএ ২৮১ এবং ইউপিএ ১২২। অর্থাৎ সব দিক থেকেই এনডিএ জোট এগিয়ে। বাংলা সংবাদ মাধ্যম রাহুল গান্ধীকে আগামী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা প্রায় করেই ফেলেছে। কিন্তু এই ঘোষণা বিড়ম্বনার কারণ হবে বলেই মনে হয়। ঠিক যেমন ২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে হয়েছিল। সবাই ধরে নিয়েছিল সিপিএম এবং কংগ্রেসের জোট ক্ষমতায় আসবে। বাস্তবে তা হয়নি। জিতেছিল তৃণমূল। এবারও তাই হবে। লোকসভায় জিতবে এনডিএ। নরেন্দ্র মোদী আবার প্রধানমন্ত্রী হবেন। ■

# বিজেপির একজন মোদী আছেন

**রন্তিদেব সেনগুপ্ত**

জাতীয় রাজনীতিতে এখন একটিই চর্চার বিষয়। তাহলো— ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে জিতে এসে সরকার গড়বে কে? নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি-ই কি আবার সরকার গড়বে? গড়লে, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র আসন সংখ্যা কি ছাপিয়ে যাবে ২০১৪-কেও? নাকি, বিরোধীদের দাবি অনুযায়ী ২০১৯-এ কেন্দ্রে বিরোধী জোটের সরকার হবে? যদি হয়, সে জোটের প্রধান কে হবেন— রাহুল গান্ধী? নাকি রাহুল বা কংগ্রেস নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা মায়াবতীর মতো কোনো আঞ্চলিক দলের নেতা বা নেত্রী সেই বিরোধী জোটের প্রধান হিসাবে আবির্ভূত হবেন? একথা ঠিকই, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনটি যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক এবং রোমাঞ্চকর হতে চলেছে। গত কয়েক দশকের ভিতর এত চিত্তাকর্ষক এবং রোমাঞ্চকর লোকসভা নির্বাচন সম্ভবত আর হয়নি। নির্বাচন এগিয়ে আসবে, কী নির্ধারিত সময়েই হবে— তা নিয়েও নানারকম জল্পনা চলছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক বাজার একটু একটু করে জমে উঠতে শুরু করেছে। শাসক এবং বিরোধী সব দলের নেতা-নেত্রী এখন থেকেই নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে বক্তব্য রাখতে শুরু করেছেন। শাসক দল বলছে— ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে আবার বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-ই ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি সভাপতি অমিত শাহের কণ্ঠেও ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের দৃঢ়তর দাবি শোনা যাচ্ছে। শাসক দলের কোনো কোনো নেতা এও বলছেন, ২০১৯-এ অনেক বেশি আসন নিয়ে

ফিরে আসবে বিজেপি। অপরদিকে বিরোধী দল, কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী এবং অন্যান্য বিরোধী নেতা-নেত্রীরা বলছেন, বিজেপি-কে সরিয়ে এবার তাঁরা সরকার গড়বেনই। বিজেপি মোকাবিলা করার জন্য তাঁরা সবকটি বিরোধী দলের জোটবদ্ধ হওয়ার কথা বারবার বলছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কোনো কোনো নেতা-নেত্রী তো আবার বিজেপিকে সরানোর ভিতর দিয়ে 'স্বাধীনতা সংগ্রামে'র স্বপ্নও দেখছেন। এখন প্রশ্ন হলো— কার দাবির পিছনে কতটা সারবত্তা রয়েছে? সত্যিই ২০১৯-এ কে দখল করবে দিল্লি?

প্রথমে আসা যাক বিরোধীদের কথায়। বিরোধীদের প্রচারের অভিমুখ পুরোটিই মোদী-মুখী। অর্থাৎ তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু নরেন্দ্র দামোদর মোদী, একমাত্র নরেন্দ্র দামোদর মোদীই। বিরোধীদের বক্তব্য এবং প্রচারের ধরন দেখলেই মনে হবে, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের বিরুদ্ধে নয়, তারা যেন লড়তে নেমেছেন ব্যক্তি নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে। অর্থাৎ বিরোধীরাই লড়াইটিকে রাজনৈতিক লড়াইয়ের বদলে ব্যক্তিগত লড়াইয়ে পর্যবসিত করেছেন। লড়াইটিকে এইভাবে যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তারা নামিয়ে নিয়ে এলেন, এতে কী লাভ হলো তাদের? ব্যক্তি নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে যখন তারা লড়াইটিকে নামিয়ে নিয়ে এলেন, তখন তাদের মনে রাখা উচিত ছিল ব্যক্তি নরেন্দ্র মোদীকে সমানে সমানে টক্কর দেওয়ার মতো একটি মুখ তাঁদের শিবিরেও থাকা উচিত ছিল। কিন্তু বিরোধীরা নিজেরাই প্রমাণ করেছেন, ব্যক্তিগত ক্যারিশমায় নরেন্দ্র মোদীকে টক্কর দেওয়ার মতো মুখ তাদের নেই। কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী এখনো সেই উচ্চতায় পৌঁছতে পারেননি। বিরোধী দলের নেতা-নেত্রীরাই তাঁকে সর্বজনগ্রাহ্য নেতা বলে মানতে রাজি হচ্ছেন না। রাহুলের নেতৃত্ব মানবেন না বলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফেডারেল ফ্রন্ট গঠনের ডাক দিয়েছেন। মায়াবতীও ঠারেঠোরে জানিয়ে দিয়েছেন, রাহুলের নেতৃত্বে তিনি চলতে রাজি নন। বিরোধী নেতা-নেত্রীরা সকলেই যে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেবেন না, এটা বুঝতে পেরেই রাহুল নিজেও বলছেন, লোকসভা ভোটের ফল বেরনোর পরই ঠিক হবে বিরোধী জোট থেকে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন। অর্থাৎ বিজেপি-এনডিএ জোটের বিরুদ্ধে কাউকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে তুলে ধরে নির্বাচনে যাওয়ার জায়গাতেই নেই বিরোধীরা। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনটিকে মোদী বনাম রাহুলে দাঁড় করাতে গিয়ে প্রথমেই হেরে বসে আছেন বিরোধীরা। এখানেই বিজেপি কয়েক কদম এগিয়ে। কারণ, বিজেপির একজন নরেন্দ্র মোদী আছেন। আর এই নরেন্দ্র মোদীর বিকল্প হিসাবে কোনো একজনকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এখনো খুঁজে পায়নি দেশের নির্বাচকমণ্ডলী। সম্প্রতি রাহুল গান্ধীর অতি বড় সমর্থক একটি বহুল প্রচারিত বাংলা সংবাদপত্র রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্রিশগড় বিধানসভা নির্বাচনের ওপর একটি আগাম সমীক্ষা করেছে। ওই সমীক্ষায় সর্বত্রই কংগ্রেসকে জয়ী ঘোষণা করা হলেও, সংবাদপত্রটি লিখতে বাধ্য হয়েছে, লোকসভায় ভোটাররা মোদীকেই চাইছেন, অন্য কাউকেই নয়। অর্থাৎ, দেশের নির্বাচকমণ্ডলীর ভিতর মোদী- হাওয়া এখনো এতটাই প্রবল যে রাহুল-পন্থী এই সংবাদপত্রটিও অন্য কিছু

লিখতে সাহস করেনি।

এবার আসা যাক বিরোধী জোট প্রসঙ্গে। বিরোধী জোটের চেহারাটা কেমন হবে? বা, আদৌ বিজেপি-এন ডি এ জোটের বিরুদ্ধে বিরোধীরা একের মোকাবিলায় এক প্রার্থী দিতে পারবেন তো? প্রথমত, বিরোধীদের জগাখিচুড়ি জোট সম্পর্কে এমনিতেই দেশের মানুষের অভিজ্ঞতা খুব ভালো নয়। দেশের মানুষ তাদের অতীত অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, যতবারই এই জগাখিচুড়ি জোট কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেছে, কোনোবারই তারা পূর্ণ মেয়াদ সরকার চালাতে পারেনি। বরং কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থে বিবাদ করে রণে ভঙ্গ দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বিজেপির মোকাবিলায় যখন আবার বিরোধী জোটের কথা ঘুরে ফিরে আসছে, তখন নির্বাচকমণ্ডলীর মনেও অতীতের স্মৃতি কিছুটা জাগরুক হবে। আর তা হলে, কখনই সেটা বিরোধী জোটের পক্ষে যাবে না। নির্বাচকমণ্ডলীর একটি অংশ নিশ্চিতভাবে কেন্দ্রে আর একবার কোনো জগাখিচুড়ি সরকার দেখতে চাইবে না। তার চেয়েও বড় কথা, বিরোধীরা মুখে যতই বলুক, এখনো পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ কোনো বিরোধী জোটের জন্ম তারা দিতে পারেনি। বিরোধীদের এই জোটের ধারণাটি প্রথম থেকেই নড়বড়ে। কংগ্রেস যতই চেষ্টা করুক, তার ছাতার তলায় সবকটি বিরোধী দলকে কখনই একত্রিত করতে পারেনি। প্রথম থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কোনো কোনো নেতার কংগ্রেসের ছাতার তলায় যাওয়ায় আপত্তি আছে। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে তেলুগু দেশমের চন্দ্রবাবু নাইডুরও কংগ্রেসের ছাতার তলায় আসার অসুবিধা রয়েছে। আবার বিরোধী ঐক্যের ফুল ফুটতে না ফুটতেই ঝরে পড়েছে। ফেডারেল ফ্রন্টের অন্যতম প্রবক্তা তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতির চন্দ্রশেখর রাও সদ্য সমাপ্ত রাজ্যসভার উপাধ্যক্ষ নির্বাচনে বিজেপিকে সমর্থন জানিয়েছেন। বিরোধী জোটের জল্পনায় জল ঢেলে তিনি ঘোষণাও করেছেন, ২০১৯-এ লোকসভা নির্বাচনের পর তাঁর সমর্থন বিজেপির দিকেই থাকবে। ওড়িশার নবীন পট্টনায়ককেও এখনো পর্যন্ত পাশে পাননি বিরোধীরা। বরং নবীন কোনো জোটেই না থাকার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। উল্টে রাজ্যসভার উপাধ্যক্ষ নির্বাচনে বিজেপিকেই সমর্থন জানিয়ে এসেছেন। বিজেপির শরিক শিবসেনাও মুখে যতই গরমাগরম কথা বলুক না কেন, রাজ্যসভায় তারাও বিজেপিকেই সমর্থন জানিয়েছে। বিরোধী জোটে যাওয়া বিষয়ে তারাও নিশ্চিত করে কিছু বলেনি। বহুজন সমাজ পার্টির মায়াবতী বলেই রেখেছেন, তাঁর দাবি মতো আসন না পেলে তিনি জোটে থাকবেন না। একটি লোকসভা আসনের উপনির্বাচনে জোট করে ফেলা, আর লোকসভার নির্বাচনে জোট করায় যে আকাশ-পাতাল তফাত তা এখন বিরোধী নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারছেন। এইরকম একটি ছন্নছাড়া চেহারা নিয়ে বিজেপিকে মোকাবিলা করা খুব একটা সহজসাধ্য হবে না বিরোধীদের পক্ষে।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এন ডি এ জোট পুনরায় জয়ী হবে, সরকার গঠন করবে। কারণ, মোদী এবং বিজেপির বিকল্প এখনও নির্বাচকমণ্ডলীর সামনে নেই।

অন্যদিকে বিজেপি। বিজেপির সব থেকে বড় সুবিধা তাদের একজন নরেন্দ্র মোদী রয়েছেন। ২০১৪ সালে প্রার্থী হিসেবে তুরুপের তাস ছিলেন এই নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে বিজেপিতে অনেকগুলি নাম বিবেচিত হলেও নরেন্দ্র মোদীকে বেছে নেওয়ার কারণ ছিল, হিন্দু নেতা হিসাবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা। মানতেই হবে, নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বের এই সময়টুকুতে তাঁকে কেন্দ্র করে হিন্দু আবেগ অনেক সংহত হয়েছে। তোষণের রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে তিনি এই ক'বছরেই প্রমাণ করতে পেরেছেন— সরকার চালাতে গিয়ে সত্যকারের নিরপেক্ষতা যদি কেউ প্রদর্শন করতে পারেন--- তাহলে সেটা তিনিই পেরেছেন। তবে, পাশাপাশি মুসলমান ভোটের একটি অংশকেও নরেন্দ্র মোদী আকৃষ্ট করতে পেরেছেন। তাৎক্ষণিক তিন তালাক রদের ভিতর দিয়ে লাঞ্ছিতা, নির্যাতিতা মুসলান রমণীদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে মুসলমান সমাজের প্রগতিশীল অংশের মন জয় করেছেন মোদী। মুসলমান সমাজের প্রগতিশীল অংশ অন্তত এটুকু বুঝতে পারছেন— মুসলমান সমাজের উন্নতি তথাকথিত প্রগতিশীল সেকুলারদের হাতে নিরাপদ নয়। নিরাপদ হিন্দু নেতা নরেন্দ্র মোদীর হাতে। এসব বিচারে ২০১৯ সালেও সঙ্ঘ পরিবারের তুরুপের তাস এই নরেন্দ্র মোদীই।

২০১৯-এ বিরোধীদের যেগুলি ঘাটতি, সেগুলিই প্লাস পয়েন্ট বিজেপির। নির্বাচকমণ্ডলী জানে বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে। কিন্তু বিরোধীদের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে তা নির্বাচকমণ্ডলীর জানা নেই। বিরোধী নেতা-নেত্রীদের রাজনৈতিক আচার-আচরণ বিবেচনা করে নির্বাচকমণ্ডলী এটুকু অন্তত বুঝতে পারছে, বিরোধীদের লড়াইটা নিতান্তই ব্যক্তি স্বার্থে, এর পিছনে কোনো আদর্শগত তাড়না নেই। তদুপরি নির্বাচকমণ্ডলী এও বুঝতে পারছে বিজেপি ক্ষমতায় এলে পরবর্তী পাঁচটি বছরের জন্য একটি স্থিতিশীল সরকার পাওয়া যাবে। কিন্তু বিরোধীরা ক্ষমতায় এলে সে বিষয়ে কোনো নিশ্চয়তা নেই। ভারতের নির্বাচকমণ্ডলীকে নিতান্তই মূর্খ ভাবার কোনো কারণ নেই। এই নির্বাচকমণ্ডলীই ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধীর মতো শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল। এরাই ২০১৪-য় কংগ্রেসের দশ বছরের টানা শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল। কাজেই বিরোধীদের কথায় ভুলে নির্বাচকমণ্ডলী মোদীর বিরোধিতায় মেতে উঠবে— এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। ভারতের সচেতন নির্বাচকমণ্ডলী ২০১৯-এও তাদের ভোটটি দিতে যাওয়ার আগে যাচাই করে নেবে— এই বিরোধীরা সত্যিই স্থিতিশীল একটি সরকার উপহার দিতে পারবে কিনা।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে কার কত আসন আসবে, বিজেপির আসন সংখ্যা বাড়বে কিনা— তার উত্তর সময়ই দেবে। তবে, একটি উত্তর এখনই দিয়ে দেওয়া যায়। তা হলো, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এন ডি এ জোট পুনরায় জয়ী হবে, সরকার গঠন করবে। কারণ, মোদী এবং বিজেপির বিকল্প এখনও নির্বাচকমণ্ডলীর সামনে নেই। ■

# মমতার ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা

**চন্দ্রভানু ঘোষাল**

দু' হাজার ঊনিশের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে কেমন ফল করবে? দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ ২২টি আসনে জেতার কথা বলেছেন। দলের রাজ্যস্তরের নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, নির্বাচন অবাধ হলে ছাব্বিশটিতেও জেতা যায়। শোনা যাচ্ছে, রাজ্য-নেতারা ২৬টি আসনে জেতার একটি ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে অমিত শাহের কাছে জমা দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো বুথে বুথে মজবুত সংগঠন না করে শুধুমাত্র ব্লু-প্রিন্ট বানিয়ে কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ছকভাঙা নেতাকে ঘায়েল করা যাবে?

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে রাজ্য বিজেপির ভূমিকা হবে মূলত ম্যানেজারের। অর্থাৎ রাজ্য-নেতাদের পারফরম্যান্স পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচক মণ্ডলীকে খুব একটা প্রভাবিত করবে না। গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্যক্তিগত ক্যারিশমা, সামনে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা, মোদী সরকারের দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তি, ভোটের অঙ্ক না কষে জাতীয় স্বার্থে কাজ করার মানসিকতা এবং স্থিতিশীল ও শক্তিশালী সরকার গঠন করার ক্ষমতা। অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকন্যা। সাধারণ বাঙালির আবেগ বোঝেন। তাদের ভাষায় কথা বলেন। কিন্তু তাঁর সরকারের স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত ভাবমূর্তি নেই। ২০১১ সালে নেত্রী হিসেবে তাঁর যে আকাশছোঁয়া উচ্চতা ছিল, বেলাগাম মুসলমান তোষণ এবং এক শ্রেণীর দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা ও রাজনৈতিক নেতার হাতের ক্রীড়ানক হয়ে পড়ায় সেই উচ্চতা অনেকটাই খর্ব হয়েছে। এখন আর তিনি আপামর বাঙালির নেত্রী নন। কেবলমাত্র মুসলমান এবং মাফিয়াদের মসিহা। তার মানে অবশ্যই এই নয় যে তিনি ফুরিয়ে গেছেন। তবে হ্যাঁ, তাঁর প্রবাদপ্রতিম জনপ্রিয়তায় এখন কিছুটা ভাটার টান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সিপিএমের ভোটব্যাঙ্কে এই ভাটার টান অনেক আগেই লক্ষ্য করা গেছিল। বস্তুত ২০১৬-র পর থেকে যে রাজনৈতিক শূন্যতা পশ্চিমবঙ্গে বিরাজমান তারই সূত্র ধরে দ্বিতীয় বিকল্প হিসেবে বিজেপি উঠে আসছে। ওপর-ওপর দেখলে অবশ্যই বোঝা যাবে না কিন্তু গ্রাম-মফস্‌সলের মানুষজনের সঙ্গে কথা বললে কিংবা মুসলমান প্রধান অঞ্চলে নিজভূমে পরবাসী হয়ে থাকা হিন্দুদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করলে, পালাবদলের একটা মৃদু পূর্বাভাস টের পাওয়া যায়। হয়তো এই পূর্বাভাস দু' হাজার ঊনিশেই সাইক্লোন হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে না, কিন্তু পড়বে। এমন একটি সাইক্লোনের জন্য অপেক্ষা করা যায়। স্বপ্নও দেখা যায়।

একটা কথা স্বীকার করতেই হবে বিজেপি এখন পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় শক্তিশালী দল। ভোটপ্রাপ্তির বিচারে দ্বিতীয় জনপ্রিয় দলও বটে। ২০১৬-র পর সংগঠিত পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি উপনির্বাচনে এই ছবি আমরা সকলেই দেখেছি। হাওড়ার উলুবেড়িয়া কেন্দ্রের কথাই ধরা যাক। আসনটি ছিল তৃণমূলের সুলতান আহমেদের। তাঁর মৃত্যুর পর ওই আসনে প্রার্থী হন তাঁর স্ত্রী সাজদা আহমেদ। জেতেন ৪.৫ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে। পরাজিত হন বিজেপি প্রার্থী। কিন্তু কথা সেটা নয়। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী পেয়েছিলেন ১,৩৭,১৩৭টি ভোট। শতাংশের হিসেবে ১১.৫ শতাংশ। কিন্তু উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী পেয়েছেন ২,৯৩,০১৮ টি ভোট। শতাংশের হিসেবে ২৩.২৯ শতাংশ। এখন প্রশ্ন হলো, বিজেপির ১২ শতাংশ ভোট কোন মন্ত্রবলে বাড়ল? তাও আবার একটি আদ্যন্ত মুসলমান প্রধান অঞ্চলে? তৃণমূলের বন্ধুরা



মেদিনীপুরে মোদীর জনসভায় উপচেপড়া ভিড়।

# বনাম বিজেপির রাষ্ট্রধর্ম

মুকুল রায়ের কথা বলবেন। একথা ঠিক, মুকুল রায়ের সঙ্গে মুসলমান নেতাদের অন্তরঙ্গতা রয়েছে। কিন্তু শুধু মুকুল রায়ের জন্যে বিজেপি উলুবেড়িয়ায় এত ভোট পেয়েছে ভাবলে অতি সরলীকরণ হয়ে যাবে। বস্তুত মুসলমানরা ভোট না দিলে বিজেপির ভোট এত বাড়ে না। আর সেই ভোট এসেছে উলুবেরিয়ার মুসলমানদের একাংশের তীব্র অভিমান থেকে। তারা মনে করছেন তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি তাদের সঙ্গে এতকাল প্রতারণা করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, টিপু সুলতান মসজিদের প্রাক্তন ইমাম বরকতিসাহেবও সম্প্রতি একই একই মন্তব্য করেছেন। অন্যদিকে, উলুবেড়িয়ার হিন্দুরা বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন মুসলমানদের ভয়ে। তেহট্ট স্কুলে সরস্বতী পুজো বন্ধ করে দেওয়ার ফতোয়া অনেক মানুষের স্মৃতিতে টাটকা। মুসলমানদের মোয়াজ্জেম ভাতা দেওয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তাদের প্রত্যাশা শূন্য। নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনেও তৃণমূল-কৃত মেরুকরণের একই ছবি দেখা গেছে। কংগ্রেসের জেতা আসন হাতছাড়া হয়েছে। জিতেছে তৃণমূল। দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে বিজেপি। সিপিএম বলার মতো কিছু করতে পারেনি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও জানেন ২০১৯র লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ভালো ফল করবে। সিপিএম এবং কংগ্রেস আরও ভাঙবে এবং সেই ভোটের একটা বড়ো অংশ বিজেপির দিকে যাবে। ভোট যত এগিয়ে আসবে তাঁর নিজের দলও ভাঙনের সম্মুখীন হবে। তাই ভাঙন রুখতে তিনি দুটি রাস্তা নিয়েছেন। ১. বিজেপির পাল থেকে হাওয়া কাড়তে নিজেকে সাচ্চা হিন্দু বলে জাহির করছেন। ব্রাহ্মণদের সভা সংগঠন করছেন, মন্দির সংস্কারে টাকা দিচ্ছেন, হনুমানজয়ন্তী পালন করছেন। ২. দ্বিধাগ্রস্ত সমর্থকদের নিজের দিকে ফেরাতে তিনি বাঙালি প্রধানমন্ত্রীর আবেগ উসকে দিচ্ছেন। বস্তুত গত আট বছরে তিনি অজস্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু তার বেশিরভাগই পালন করেননি। তাই খুড়োর কল দেখিয়ে বাজিমাত করা ছাড়া তার আর কোনও উপায় নেই। একথা ঠিক, বাঙালি প্রধানমন্ত্রী— এই শব্দবন্ধটি বহু শহুরে-মধ্যবিত্তকে দিবাস্বপ্ন দেখতে সাহায্য করবে এবং তাদের ভোটও মমতা পাবেন। আপাতত সেটাই মমতার লক্ষ্য— হুজুগে বাঙালির মাথায় হাত বুলিয়ে কিছু ভোট আদায় করা! হ্যাঁ, এটা ঠিক, মমতা প্রধানমন্ত্রী হতে চান। এটা তার ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ফেডারেল ফ্রন্টের পরিকল্পনা সেই কারণেই। কিন্তু কাদের নিয়ে হবে ফ্রন্ট? নেতা কে হবেন? মমতা নেতা হলে মায়াবতীর রাগ। মায়াবতী হলে রাহুলের গোঁসা। প্রত্যেকের নামেই সিবিআই ফাইল আছে। প্রধানমন্ত্রী না হলে সেসব গায়েব করা যাবে না। কিন্তু এই ধরনের নেতাদের নিয়ে ফ্রন্ট হলে তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। কারণ মিলিজুলি সরকারের অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষের রয়েছে। তিক্ত অভিজ্ঞতা বলাই ভালো। দেশের একটি অঙ্গরাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ যেমন সেই অভিজ্ঞতার অংশীদার হয়েছে, আবার আঞ্চলিক পরিসরেও এ রাজ্যে ঘটেছে অনুরূপ ঘটনা। দু'জনেই বামপন্থী, তবুও অজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন জ্যোতি বসু। পতন হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার। জ্যোতি বসু সবসময় শীর্ষে থাকতে চাইতেন। তার জন্য সম্ভব-অসম্ভব অনেক কিছুই করতে পারতেন।

জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কারোর ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ২০১৯-র ভারতবর্ষ স্বীকৃতি দেবে না। পশ্চিমবঙ্গে ছবিটা একটু অন্যরকম। এখানে মমতা হারবেন না, কিন্তু বিজেপি জিতবে। ২০২১-এ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় আসার পথ বিজেপি আরও একটু সুগম করে নেবে। অমিত শাহ প্রায়ই পশ্চিমবঙ্গকে শেষ দুর্গ বলেন। রাষ্টধর্মে অবিচল থেকেই বিজেপি শেষ দুর্গজয়ের দিকে এগিয়ে যাবে।

কলকাতায় অমিত শাহের বিশাল জনসভার একাংশ।

# এই সময়

## শাসন ও সংগঠন

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর মৃত্যুতে সারা দেশ এখন শোকস্তব্ধ। প্রয়াত

নেতার বাড়িতে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভেঙে পড়েন। অটলবিহারীকে 'বাবার মতো' আখ্যা দিয়ে বলেন, 'অটলজী আমাকে শাসন ও সংগঠনের নিয়মকানুন শিখিয়ে ছিলেন।'

## বীরধর্ম

এরকম বৃষ্টি কেরলে সম্ভবত আগে কখনও হয়নি। রাজ্যের মানুষ যখন ভয়াবহ বন্যায় আতঙ্কের প্রহর গুণছেন, রাজ্য সরকার

সাধ্যমতো চেষ্টা করেও যখন পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে পারছে না, ঠিক সেই সময় এগিয়ে এল কেন্দ্র সরকার। ভারতীয় সেনা উদ্ধার করল অসংখ্য বন্যাদুর্গত মানুষকে।

## স্পষ্ট কথায়

পাকিস্তান আলোচনার অনুরোধ জানিয়েছিল। সেই অনুরোধ মেনে ভারতীয় সেনার ডিরেক্টর জেনারেল অব মিলিটারি অপারেশনস অনিল

চৌহান পাক সেনা-কর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। তিনি স্পষ্ট বলেন, নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর গ্রামগুলিতে জঙ্গি অনুপ্রবেশ বন্ধ না হলে এলাকার শান্তি ফিরবে না।

সমাবেশ -সমাচার

# এবিভিপি-র কৃতী বিদ্যার্থী সংবর্ধনা

ভারতের বৃহত্তম ছাত্র সংগঠন, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, তাদের ৬৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কলকাতা শাখার উদ্যোগে গত ২৮ জুলাই '১৩ তম কৃতী বিদ্যার্থী সংবর্ধনা ২০১৮' আয়োজন করে কালীঘাটে যোগেশ মাইম অ্যাকাডেমি-তে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সুদীপ্ত মুখার্জি, এবিভিপি কলকাতা-সভাপতি ড. অভিষেক হালদার,

এবিভিপি কলকাতা-কোষাধ্যক্ষ রামজ্যোতি সরকার, রিসার্চ স্কলার সুদেব রায় প্রমুখ। অধ্যাপক চ্যাটার্জি জানান, 'জ্ঞান চরিত্র একতা'র মন্ত্রে দেশের ছাত্র সমাজকে উদ্বুদ্ধ ও তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করে যোগ্য মানুষ তৈরির মাধ্যমে ছাত্র শক্তিকে রাষ্ট্র শক্তিতে পরিণত করাই বিদ্যার্থী পরিষদের মূল উদ্দেশ্য।' কলকাতায় দুটি অনুষ্ঠানে ৩০০-র বেশি কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে সংবর্ধনা জানানো হয়। উল্লেখ্য, বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি জেলায় ২টি করে কৃতী বিদ্যার্থী সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। তাতে মোট ২২ হাজার কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

# উত্তরবঙ্গ সংস্কার ভারতীর বার্ষিক সাধারণ সভা

সর্বভারতীয় কলা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংস্থা সংস্কার ভারতী উত্তরবঙ্গ প্রান্তের বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২৮ জুলাই মালদা জেলার কলিগ্রাম সরস্বতী শিশু মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর সর্বভারতীয় সম্পাদক বিশ্রাম জামাদার, সংস্কার ভারতীর

# এই সময়

## রাম অবতার

ভারতের প্রায় সব রাজনৈতিক নেতাই অটলবিহারী বাজপেয়ীকে শ্রদ্ধা করতেন। দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে তিনি হয়ে উঠেছিলেন

রাষ্ট্রনেতা। এমন একটি সর্বজনমান্য চরিত্রকে কি বলিউড অবহেলা করতে পারে? তাই এবার তিনি সিনেমায়। অটলবিহারীর চরিত্রে অভিনয় করবেন রাম অবতার ভরদ্বাজ।

## নারীশক্তি

নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সবসময়েই ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছেন।

সম্প্রতি তিনি ঘোষণা করেছেন শর্ট সার্ভিস কমিশনের (এস এস সি) আওতায় যেসব মহিলা অফিসারদের ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হয়েছে তাঁরা স্থায়ী কর্মীর মর্যাদা পাবেন।

## ঈশ্বরের নিজের স্বর্গ

নিঃসন্দেহে উত্তরপূর্বাঞ্চল ভারতের সুন্দর

জায়গাগুলির মধ্যে অন্যতম। এখানকার সংস্কৃতি এবং প্রাচীন পরম্পরাও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। তাই উত্তরপূর্বের পর্যটন শিল্পকে উন্নত করার জন্য মণিপুরের রাজ্যপাল নাজমা হেপতুল্লা নর্থ ইস্ট সার্কিট : ইম্ফল ও খোংজোমের উদ্বোধন করলেন সম্প্রতি।

# সমাবেশ -সমাচার

পূর্ব ক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদক নিরঞ্জন পণ্ডা, সংগঠনের পূর্বক্ষেত্র প্রমুখ নীলকণ্ঠ রায় এবং উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সংগঠন সম্পাদক তড়িৎ কুমার মিশ্র। 'সাধয়তি সংস্কার ভারতী ভারতে নব জীবনম্' গীতের মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা হয়। এবং পরে পদাধিকারীরা ভারতমাতা ও নটরাজের মূর্তিতে পুষ্প প্রদান করেন। অতিথিবরণ পর্বের পর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

## ফরাক্কায় সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির

সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে ফরাক্কায় সরস্বতী শিশুমন্দিরে গত ১৬ থেকে ২৬ জুলাই দশ দিবসীয় সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির চালানো হয়। শিবিরে প্রতিদিন ৬ স্থান থেকে প্রায় ৩৬ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। শিবিরে শিক্ষক ছিলেন ডি পি এস এন টি পি সি, ফরাক্কার বিশেষ

শিক্ষক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়। শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে জিতুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা রুমা ঘোষ, ডিপিএসের আর্ট শিক্ষক দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং সংস্কৃতভারতীর উত্তরবঙ্গ প্রান্ত শিক্ষণ প্রমুখ সুমন্ত প্রামাণিক উপস্থিত ছিলেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা দশদিনে যতটা শিখেছেন ততটাই গান নাটক ও অভিনয়ের মাধ্যমে প্রদর্শন করেন।

## শ্রীবড়বাজার কুমার সভা পুস্তকালয়ের কার্যসমিতি নির্বাচন

গত ৪ আগস্ট কলকাতা মহানগরের প্রখ্যাত সাহিত্যিক সংস্থা শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের বার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন কার্যসমিতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী পুনরায় পুস্তকালয়ের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। উপসভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মোহনলাল পারীক ও শান্তিলাল জৈন। সম্পাদক--- মহাবীর প্রসাদ বাজাজ,

# এই সময়

## বন্ধুর জন্য

ভারত এবং নেপাল এক অখণ্ড বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। বহুবার ভারত তার বন্ধুর একাধিক

উদ্যোগের পাশে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি ভারত নেপালের তেরাই রোড প্রকল্পে ৪৭০ মিলিয়ন নেপালি টাকা অনুদান দিয়ে বন্ধুত্বের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করেছে। ধন্যবাদ জানিয়েছে নেপাল।

## তোমার জন্য, দেশ

একজন নাবিক, একটি নৌকো এবং ভারতের জাতীয় পতাকা। তিনটি খণ্ডচিত্রকে মেলালে

যার ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তিনি অভিলাষ টমি কেসি। অভিলাষ ভারতীয় নৌসেনার সদস্য। আপাতত তিনি ব্যস্ত গোল্ডেন গ্লোব রেসের প্রস্তুতিতে। সঙ্গে তার স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের ছবি।

## ফেরত

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদুঘর থেকে ষাট বছর আগে চুরি যাওয়া দ্বাদশ শতকের বুদ্ধমূর্তি

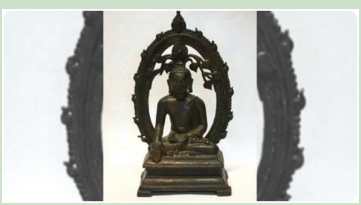

ভারতে ফিরে এল। স্বাধীনতা দিবসের উপহার হিসেবে ভারতের গর্ব ভারতকে ফিরিয়ে দিল লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশ।

# সমাবেশ -সমাচার

সহসম্পাদক— গজানন্দ রাধী ও সত্যপ্রকাশ রায়। কোষাধ্যক্ষ— অরুণ প্রকাশ মল্লাবত, সাহিত্য সম্পাদক— বংশীধর শর্মা। সদস্য— শ্রীমতী দুর্গা ব্যাস, নন্দকুমার লঢা, ভাগীরথ সারস্বত, রামগোপাল সুংঘা, চন্দ্রকুমার জৈন, রূপলাল সুরানা, শ্রীমতী সুধা জৈন, ভঁওরলাল মুন্ধ্রা, রামচন্দ্র অগ্রবাল, যোগেশরাজ উপাধ্যায়, গিরিধর রায়, সত্যেন্দ্র সিংহ অটল, শঙ্কর বক্সসিংহ, সঞ্জয় রস্তোগী, মনোজ কাকড়া, শ্রীরাম সোনী এবং রাজকমল বাংগড়।

## কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান

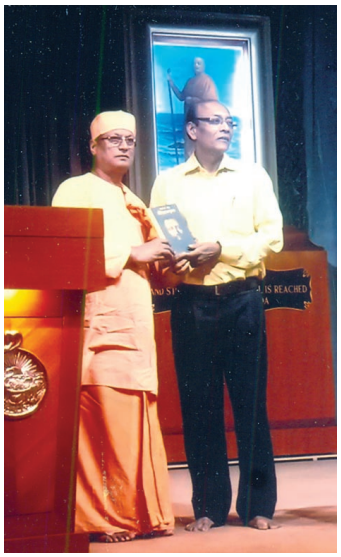

গত ২৫ জুলাই সন্ধ্যায় কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের ঐতিহ্যপূর্ণ বিবেকানন্দ সভাঘরে কথামৃত পাঠ ও পর্যালোচনার পর 'মনের বন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সম্পাদক স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজ। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন লেখক চিন্ময় সেনগুপ্ত, প্রকাশক এশিয়ান পাবলিকেশনের কর্ণধার মৃত্যুঞ্জয় দিন্দা এবং পরিবেশক চন্দন দত্ত। গ্রন্থ প্রকাশের পর লেখক তার সারগর্ভ ভাষণে জানান যে ইতিপূর্বে 'কথামৃত' নিয়ে সংসারীদের উপযোগী এ ধরনের বাস্তবমুখী ব্যবহারিক তথা প্রয়োজন-ভিত্তিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। সংসারী ভক্তজনেরা তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনে মনের নানা সমস্যার সমাধান, নানা দ্বন্দ্বের নিরসন এবং বহু সংশয়ের অবসান যাতে সার্থকভাবে করতে পারেন গ্রন্থটি শ্রীরামকৃষ্ণের সেই সব ব্যবহারিক ও অন্তরঙ্গ পথনির্দেশেরই সুবিন্যস্ত সমাহার।

স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজ তাঁর সমাপ্তি ভাষণে বিস্তারিত ভাবে বইটির বিষয়বস্তু ও ব্যবহারিক মূল্য সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করে পরিশেষে বলেন, 'দুঃখ, দুশ্চিন্তা, অশান্তি, একাকিত্ব— এই সব ব্যাধি তো মনেরই। তাই মন একজনকে বন্ধু হিসেবে পেতে চায়। এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া কে আর আমাদের মনের বন্ধু হবেন?'

অনুষ্ঠানের শেষে সমাগত ভক্তজনেরা সানন্দে গ্রন্থটি সংগ্রহ করেন।

## কলকাতা বিবেকানন্দ যোগ অনুসন্ধান সংস্থার যোগ ইনস্ট্রাক্টর কোর্স

পশ্চিমবঙ্গে যোগ অনুশীলনের প্রচার ও প্রসারের জন্য বেঙ্গালুরুর আন্তর্জাতিক মানের যোগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কলকাতা বিবেকানন্দ যোগ অনুসন্ধান সংস্থার উদ্যোগে কলকাতার টালিগঞ্জে যোগ ইনস্ট্রাক্টর কোর্স শুরু হয় গত ৪ আগস্ট। সেদিন উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গালুরুর যোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অভিজিৎ ঘোষ। যোগ প্রশিক্ষক কোর্সের উদ্বোধন করেন গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের স্বামী বেদস্বরূপানন্দ মহারাজ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিবেকানন্দ যোগ অনুসন্ধান কেন্দ্রের নির্দেশক বিষ্ণু কুমার ধানুকা ও স্বামী চিন্ময়ানন্দ মিশনের অধ্যক্ষ। ৪৪ জন যোগ প্রশিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে স্বামী বেদস্বরূপানন্দ মহারাজ প্রতিষ্ঠান পরিসরে ৫ ফুট উচ্চতার স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন।

# আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য

**সজল আচার্য**

উত্তরপূর্বাঞ্চলের ছোট্ট প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ রাজ্য ত্রিপুরা। একদা এই রাজ্যের ভৌগোলিক সীমা ছিল বিশাল। ত্রিপুরার ইতিহাসের কিছুটা তথ্য পাওয়া যায় 'রাজমালা' নামক গ্রন্থে। এই রাজমালাতে ১৭৯ জন রাজার নাম রয়েছে। ত্রিপুরার মাণিক্য রাজারা সকলেই বাংলাভাষা, সাহিত্য, সংগীত এবং সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য ছিলেন মাণিক্য রাজবংশের শেষ নৃপতি।

মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্যের বয়স যখন ১৫ বছর তখন তাঁর পিতা মহারাজ বীরন্দ্রেকিশোর মাণিক্যের মৃত্যু হয়। তিনি নাবালক হওয়ায় শাসন পরিচালনার জন্য একটি শাসন পরিষদের উপর ন্যস্ত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার আনুষ্ঠানিক ভাবে বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্যকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী মহাসমারোহে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনিই রাজ্যের প্রথম রাজপুত্র যিনি রাজপরিবারের গণ্ডির বাইরে গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন।

তাঁর আমলের মুখ্য ঘটনা ছিল— ত্রিপুরায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রভাব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রসার, বিভিন্ন সংস্কার, শিল্পসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা, বিশ্বপরিক্রমা এবং রিয়াং বিদ্রোহ। তিনি প্রথম বিশ্বপরিক্রমা শুরু করেন ১৯৩০ সালে ২০ জানুয়ারি, দীর্ঘ ৮ মাস। পরবর্তী সময়ে ১৯৩৬ সালে দীর্ঘ ৫ মাস। প্রথমে সফরসঙ্গী ছিলেন শিক্ষক পুলীসাহেব এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ছিলেন রানি কাঞ্চন প্রভাদেবী। এই ভ্রমণকালে ইতালির ফ্যাসিস্ট নেতা মুসোলিনি, জার্মানির নাৎসি নেতা হিটলার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই সময়েই কালিফোর্নিয়াতে বেতার ভাষণ দেন, জাতি সঙ্ঘের অধিবেশন দর্শন করেন। মহারাজার সম্মানে সানফ্রান্সিসকোতে ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি ভোজসভায় আপ্যায়িত করেন। অস্ট্রেলিয়ার সরকারও সিডনিতে ভোজসভায় সংবর্ধনা জানান। দেশের রাজা ও মহারাজারা বীরবিক্রমকে সৌজন্য সহকারে অভ্যর্থনা জানান। বিদেশের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে প্রথমেই তিনি মন্ত্রণাসভা, ব্যবস্থাপকসভা ও মন্ত্রীপরিষদ এই তিনভাগে শাসনব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করেন। এমনকী গ্রামের জনসাধারণকে শাসন ক্ষমতার শরিক করার জন্য 'গ্রামমণ্ডল' গঠন করেছিলেন। বীরবিক্রম বুঝতে পেরেছিলেন স্বচ্ছ প্রশাসনিক নেতৃত্বের ওপর প্রশাসনিক সাফল্য নির্ভর করে। এই প্রশাসনিক সাফল্যের উদ্দেশ্যে তিনিই প্রথম রাজ্য সিভিল সার্ভিস ক্যাডার গড়ে তোলেন। প্রশাসনে গতিশীলতা এবং রাজকার্য পরিচালনা ও উন্নতির জন্য প্রতি বছর প্রধান কর্মচারীদের সম্মেলন হতো। যেসব রাজকর্মচারী কর্মকুশলতা ও কর্তব্যপরায়ণতা প্রদর্শন করেছেন, মহারাজ তাঁদের উৎসাহদান ও স্বীকৃতিস্বরূপ 'কর্মবীর' 'কর্মদক্ষ' 'কর্মনিষ্ঠ' ইত্যাদি উপাধি প্রদান ও পদক দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে রাজ্যের রাজকর্মচারীদের মধ্যে ভালো কাজ প্রদর্শনের প্রবণতা দেখা যায়। উপরন্তু যেসব মননশীল গুণীজন রাজ্যের হিতসাধনে সদানিযুক্ত, মহারাজ তাঁদেরও উৎসাহিত করার জন্য 'মহামান্যবর' 'মান্যবর' ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করেন।

রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের জন্য বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেছিলেন। কৃষির উন্নতির জন্য পার্বত্য প্রজাদের জুমচাষের পরিবর্তে হালচাষে উৎসাহিত করেন। এজন্য কিছুটা জমি সংরক্ষিত রাখেন। মৌখিক ভাবে জমি ক্রয়বিক্রয় নিষিদ্ধ করেন। রাস্তাঘাট নির্মাণের উদ্দেশ্যে প্রতি মহকুমার উন্নয়ন বিষয়ক নগরসমিতি ও পূর্তবর্ত্ম-সংক্রান্ত উন্নয়ন সমিতি' গঠন করেন। ত্রিপুরার আগরতলা বিমান বন্দরটি তিনিই স্থাপন করেন। আগরতলাকে পরিকল্পিত শহর হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সরকারি অনুমোদন ছাড়া যেখানে সেখানে পাকাবাড়ি নির্মাণ নিষিদ্ধ করা হয়। গ্রামের উন্নয়নের ভার গ্রামগুলির উপর ন্যস্ত করা হয়। আগরতলার ট্রেজারিতে ব্যাংক স্থাপন ছাড়াও আর্থিক লেনদেনের সুবিধার্থে ১৯৩৫ সালে 'ত্রিপুরা স্টেট ব্যাংক' স্থাপন করেন। তিনি 'বিদ্যাপত্তন' নামক একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে আগরতলায় একটি গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেন যার অধীনে থাকবে সাধারণ ডিগ্রি কলেজ, মেডিকেল কলেজ, কৃষি কলেজ, চারুকলা ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এজন্য আগরতলা শহরের পূর্বপ্রান্তে কলেজ টিলায় জমিও নির্দিষ্ট করা হয়। কিন্তু তিনি তাঁর জীবিতকালে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে যেতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর

পর এই পরিকল্পনা আংশিক রূপদান করা হয় মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ (MBB Collage) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এছাড়াও আগরতলার নগরপরিকল্পনা, বৌদ্ধমন্দির, বেণুবনবিহার এবং রুদ্রসাগরের নীরমহল প্রাসাদ নির্মাণ তারই অমূল্যদান।

বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্যের আমলে বৃহত্তর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ত্রিপুরাকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ত্রিপুরাতেও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪১ সালে 'ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনতন্ত্র' বা ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের ১ আইন' নামে এক শাসনতন্ত্র রচিত হয়। এতে স্থির হয় যে, রাজসভা বা প্রিভিকাউন্সিল মন্ত্রণা সভা হিসাবে শাসন ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে রাজাকে উপদেশ দেবে। প্রধানমন্ত্রী ও অনধিক চারজন মন্ত্রী নিয়ে গঠিত একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হবে। এর হাতে প্রশাসনের অনেক দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে কয়েকটি গ্রামের সমন্বয়ে গ্রামমণ্ডলী বা গ্রাম্য ইউনিয়ন সমূহ গঠিত হবে এবং প্রতি গ্রামের অধিবাসী কর্তৃক নিজ নিজ মণ্ডলীর তত্ত্বাবধায়ক বোর্ড নির্বাচিত হবে। এই বোর্ডসমূহ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন পরিচালনা, নির্দেশিত ট্যাক্স বা কর আদায় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচার ক্ষমতা প্রাপ্ত হবে। অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য এই শাসনব্যবস্থা বাস্তব রূপায়ণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ১৯৪১ সালের পর থেকে 'ত্রিপুরা দরবার' শব্দের পরিবর্তে 'ত্রিপুরা সরকার' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য ইংরেজ সরকারকে সবরকমের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি ১৯৪০ সালে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় একটি করে বিভাগীয় যুদ্ধ কমিটি এবং রাজধানী আগরতলায় একটি কেন্দ্রীয় যুদ্ধ কমিটি গঠন করেন। ১৯৪১ সালে একটি যুদ্ধভাণ্ডার বা যুদ্ধ তহবিলও গঠন করেন। জনজাতি সমাজের লোকেরা যাতে সেনাদলে যোগদান করে, সেজন্য তিনি বিশেষ উৎসাহ দেন। 'প্রথম ত্রিপুরা রাইফেল বাহিনী' আরাকান ও বর্মাযুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। ১৯৪১ সালে রায়পুরের (ঢাকা জেলা) ও ১৯৪৬ সালে নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত হিন্দুরা উদ্বাস্তু হয়ে ত্রিপুরার এলে তাদের আশ্রয়দান ও সাহায্য করেন। সাম্প্রদায়িক প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সদরে উপযুক্ত হিন্দু ও মুসলমান সদস্য নিয়ে একটি 'প্রীতিবর্ধায়ক সমিতি' গঠন করেন।

বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য একজন সংগীতজ্ঞ এবং অনেক সংগীত রচনা করেন। তিনি 'জয়াবতী' নামে একটি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ বাংলা ১৩৪৮ সালের ২৫ বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ৮০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে আগরতলায় রবীন্দ্র জয়ন্তী দরবার আহ্বান করেন এবং এই দরবারে কবিকে 'ভারতভাস্কর' উপাধিতে ভূষিত করেন। প্রসঙ্গত এর চার মাসের ব্যবধানে কবিগুরুর মহাপ্রয়াণ ঘটে। বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য অনেক শিল্প-সাহিত্য সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন (কুমিল্লা অধিবেশন), কলকাতায় অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রশিল্প প্রদর্শনী ও মেলা, বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ ও ত্রিপুরা হিতসাধনীসভা, রাজরাজাদের সর্বভারতীয় সংগঠন 'চেম্বার অব প্রিন্সেস' তাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৩৯ সালে কবিগুরুর আমন্ত্রণে সপারিষদ তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। কবিগুরু অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন— ''আজকের এই অস্তোমুখ সূর্যের মতোই আমার হৃদয় জীবনের পশ্চিম দিগন্ত থেকে তোমার প্রতি তাঁর আশীর্বাদ বিকীর্ণ করছে।''

বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্যের রাজত্বকালে একদিকে যেমন ত্রিপুরায় ক্রমশ গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে, তেমনি অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও আর্থসামাজিক অন্যায়ও লক্ষ্য করা যায়। ফলে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রত্নমণির নেতৃত্বে 'রিয়াং বিদ্রোহ' শুরু হয়। যদিও তিনি এই বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ত্রিপুরায় রাজন্য যুগের যে কয়েকটি প্রজাবিদ্রোহ হয়েছে তার কোনোটিই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়। প্রধানত অর্থনৈতিক কারণে রাজকর্মচারীদের অহেতুক নির্যাতনের বিরুদ্ধেই। এসব বিদ্রোহের পেছনে কোনো প্রকার রাজনীতি ছিল না। তবে রাজসিংহাসনের দাবিদার রাজপরিবারের কোনো কোনো মহলের গোপন মদত ছিল।

ত্রিপুরাবাসীর দুর্ভাগ্য হলো দেশের খুব জটিল ও সংকটজনক মুহূর্তে ব্রিটিশ শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য দেশের মানুষ যখন এক অস্থির পরিস্থিতির মুখোমুখি ঠিক তখনই রাজ্যের বিচক্ষণ মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। সেটা ছিল ১৯৪৭ সালের ১৭ মে। ভারত স্বাধীনতা লাভের তিন মাস আগে। পুত্র যুবরাজ কিরীটবিক্রম নাবালক হওয়ায় ভারত সরকারের নির্দেশে রাজমাতা মহারানি কাঞ্চনপ্রভাদেবী ১৩ আগস্ট ১৯৪৭ সালে ত্রিপুরা ভারতভুক্তির সিদ্ধান্ত নেন। স্বাধীনতার পূর্বে এই সিদ্ধান্ত না নিলে পাকিস্তান ভুক্তির দাবিতে পাকবাহিনীর দ্বারা ত্রিপুরা আক্রান্ত হতো। সেরকম প্রস্তুতি পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলিম লিগ নেতৃত্ব নিয়েছিল। এই খবর পেয়ে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল অসম থেকে ত্রিপুরায় একদল সেনা পাঠাবার জন্য জরুরি নির্দেশ দেন। কাশ্মীরের রাজা হরি সিংহ ভারতভুক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত থাকায় পাকবাহিনী কাশ্মীর আক্রমণ করে বিরাট অঞ্চল দখল করে, যা এখনও একজটিল জাতীয় সমস্যা হিসাবে রয়েছে। কালের বিবর্তনের সঙ্গে সমতল ত্রিপুরা এবং পার্বত্য ত্রিপুরার রাজনৈতিক মানচিত্র ভিন্ন হয়ে পড়ে। এখন রাজতন্ত্র অবলুপ্ত। ১৯৫৬ সালে ভারতের রাজ্যগুলির পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরা একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলরূপে ঘোষিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ২১ জানুয়ারি ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। রাজ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট সরকারে ছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত ত্রিপুরার রূপকার বীরক্রিমকিশোর মাণিক্য সম্বন্ধে কোনও শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়নি। কংগ্রেস ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধীর বন্দনা আর বামফ্রন্ট কার্ল মার্ক্স আর লেনিন বন্দনা করেছে। নতুন প্রজন্মের কাছে এদেশের বহু মনীষীকে অন্ধকারে রেখেছে। ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসার পূর্বেই আন্দোলন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিমানবন্দনের নাম হোক মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্যের নামানুসারে। হয়েছেও তাই।

**তথ্যসূত্র :** (১) মাণিক্য শাসনাধীন ত্রিপুরার ইতিহাস— ড. নলিনীরঞ্জন রায়চৌধুরী। (২) ত্রিপুরার ইতিহাস ও সংস্কৃতি— সুচিন্ত্য ভট্টাচার্য।

# ঐতিহ্যমণ্ডিত ঝুলনযাত্রা

**সপ্তর্ষি ঘোষ**

মধ্য কলকাতার বৌবাজার এলাকায় বাবুরাম শীল লেনে রামকানাই অধিকারীর ঠাকুরবাড়ির ঝুলন কলকাতার একটি অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত ঝুলনযাত্রা। রামকানাই অধিকারীর পিতামহ কৃষ্ণমোহন অধিকারী আজ থেকে প্রায় দু'শো বছর আগে বৌবাজারে ঠাকুরবাড়ি তৈরি করে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঝুলনযাত্রার সূত্রপাত করেন, অবিচ্ছিন্নভাবে যা আজও অব্যাহত। কষ্টিপাথরে নির্মিত কৃষ্ণ এবং অষ্টধাতুর রাধিকা মূর্তি কাষ্ঠনির্মিত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। অত্যন্ত নয়নাভিরাম এই যুগল মূর্তি।

কৃষ্ণমোহন ঠাকুরবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা হলেও তাঁর পৌত্র রামকানাই অধিকারী ঠাকুরবাড়ির উন্নতিসাধন করেন এবং তাঁর সময় থেকেই ঝুলনে জাঁকজমক বৃদ্ধি পায়। রামকানাই নিষ্ঠাবান ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাধাকৃষ্ণের স্বর্ণালঙ্কার তৈরি করেন এবং ঝুলন উৎসবের জন্য একটি রূপো ও সোনার সিংহাসন নির্মাণ করেন। ঠাকুরবাড়ির নিত্যসেবা এবং অন্যান্য উৎসবের ব্যয় নির্বাহের জন্য রামকানাই একটি ট্রাস্ট গঠন করেন। ১৩২৪ বঙ্গাব্দে (ইংরেজি ১৯১৭ সালে) ৭২ বছর বয়সে রামকানাই অধিকারীর জীবনাবসান হয়।

তাঁর মৃত্যুর পর একমাত্র পুত্র ধর্মদাস অধিকারী ঠাকুরবাড়ির সেবায়েতের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ৬৩ বছর বয়সে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে তিনি প্রয়াত হন। পরবর্তীকালে ধর্মদাস অধিকারীর দুই পুত্র শিবদাস ও দেবদাস অধিকারীর উপর সেবায়েতের দায়িত্ব অর্পিত হয়। আমৃত্যু তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমান প্রজন্মও পূর্বসূরির ঐতিহ্যকে সগৌরবে বহন করে চলেছেন।

ঝুলনের পাঁচ দিন রাধাকৃষ্ণ-কে যথাক্রমে রাখাল, যোগী, সুবল, কোটাল এবং রাজবেশ— পাঁচরকম বেশে সাজানো হয়। একদা প্রয়াত শিবদাস অধিকারী মহাশয় নিজে রাধাকৃষ্ণকে সাজাতেন। ঝুলনের শেষ দিনে রাধাকৃষ্ণকে

সোনার সিংহাসনে বসানো হয়। ঐতিহ্যপূর্ণ ঝুলনাযাত্রা দেখতে পাঁচ দিন বহু দর্শকের সমাগম হয়। প্রতিদিনই অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা থাকে।

ঝুলনের পাঁচ দিন সন্ধ্যারতির পর শাস্ত্রীয় সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের আসর বসে ঠাকুরবাড়ির নাটমন্দিরে। অতীতে যদু ভট্ট, অঘোর চক্রবর্তী, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, গিরিশ ভট্টাচার্য, লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী প্রমুখ প্রথিতযশা শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করেছেন। সেই ধারা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। লব্ধ প্রতিষ্ঠ শিল্পীদের সুরের মূর্ছনায় ঝুলনের পাঁচ দিন রামকানাই অধিকারীর ঠাকুরবাড়িতে এক সাংগীতিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়, যা সংগীত রসিক শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখে।

পাঁচদিন ব্যাপী ঝুলনযাত্রা শুরু হবে ২২ আগস্ট, যার পরিসমাপ্তি হবে ২৬ আগস্ট। এবারও যথারীতি মজলিশ বসবে ঠাকুরবাড়ির নাটমন্দিরে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
**প্রণব**
পড়ুন ও পড়ান

# যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩


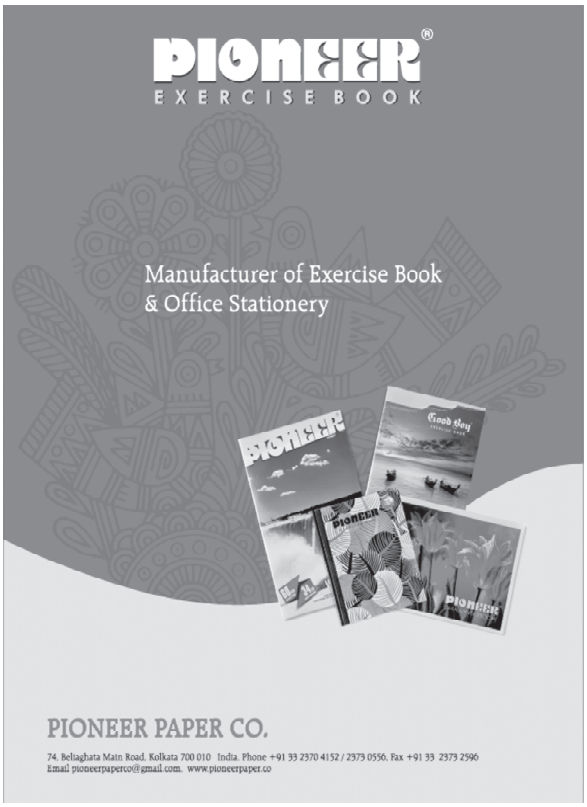



# বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

*নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।*
*মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।*

**শান্তিনিকেতন, বোলপুর,**
**মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫**


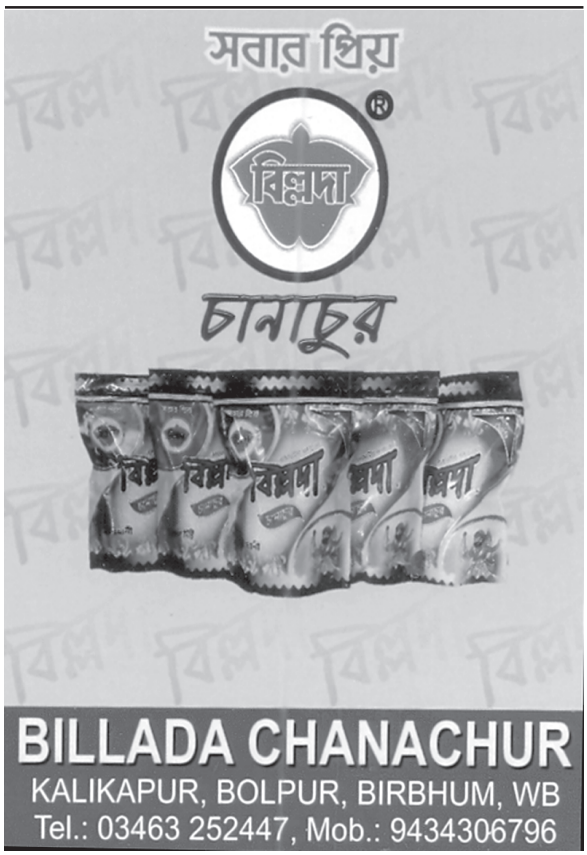

# স্বাধীনতা সংগ্রাম ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

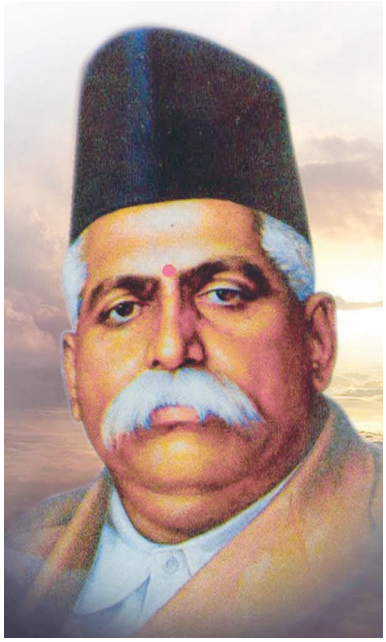

**সুব্রত ভৌমিক**

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি— অভিযোগটি সত্যিই হাস্যকর। সঙ্ঘ সৃষ্টির পটভূমিকা সঠিক ভাবে জানলে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তিই এধরনের অবান্তর অভিযোগ করতে পারেন না। একথা সর্বজনবিদিত যে, সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজী কলকাতার ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়তে আসেন এবং এখানকার বিপ্লবী সংগঠন 'অনুশীলন সমিতির' সঙ্গে সক্রিয় ভাবে যুক্ত হন। সেসময় তাঁর ছদ্মনাম ছিল 'কোকেন'। বিপ্লবীদের মধ্যে সাহস, বীরত্ব, ত্যাগ সবকিছু থাকা সত্ত্বেও জনগণের মধ্যে সঠিক চেতনা ও বীরব্রতের অভাব থাকার কারণে তারা বিপ্লবীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার সাহস দেখাতে পারেনি। ফলে সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন বিপ্লব প্রচেষ্টা ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ব্যর্থ হয়। এমনকী ব্রিটিশরা বিপ্লবীদের দমন করতে দেশীয় মানুষদেরই সাহায্য নেয়। ডাক্তারজী এরপর নাগপুরে ফিরে এসে বিকল্প পথের সন্ধানে কংগ্রেসের একজন সক্রিয় সদস্য রূপে গান্ধীজীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে, গান্ধীজীর তাকে কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে একত্রিত হচ্ছেন। তাই গুপ্ত বিপ্লবী কার্যকলাপের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে দেশাত্মবোধ, নিঃস্বার্থ বুদ্ধি, ত্যাগের ভাবনা জাগানোর তথা রাষ্ট্র চরিত্র নির্মাণের যে ঘাটতি ছিল তা হয়তো গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের মাধ্যমে পূরণ হবে।

১৯২১ সালে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে উগ্র ভাষণের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা শুরু হয়। মামলা চলাকালীন আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা শুনে বিচারক বলেন যে, সেই বক্তব্য তাঁর আগের বক্তব্যের থেকেও বেশি উত্তেজক ও মারাত্মক। তাঁর ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কারাবাসের সময় নিরন্তর চিন্তনের ফলে তাঁর মনে প্রশ্ন ওঠে যে আমরা জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সম্পদে শ্রেষ্ঠ জাতি হওয়া সত্ত্বেও বারবার পরাধীন হলাম কেন? ব্রিটিশ আজ অথবা কাল দেশ ছেড়ে যাবে এটা নিশ্চিত। কিন্তু যে কারণগুলির জন্য আমরা পরাধীন হয়েছি এবং দীর্ঘ পরাধীনতার ফলে আমাদের মজ্জায় মজ্জায় যে পরানুবাদ, পরানুকরণ ও দাসসুলভ মানসিকতা ঢুকে গিয়েছে— দেশ স্বাধীন হলেই কি তা লোপ পাবে? আবার সেই আত্মকলহ, স্বার্থপরতা, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দেবে না তো? তার জন্য আবার আমরা পরাধীন হব না, বা বিদেশি শক্তি আমাদের ওপর ছড়ি ঘোরাবে না তো? কারণ, স্বাধীনতা অর্জনের থেকেও স্বাভিমানের সঙ্গে তা রক্ষা করা আরও কঠিন কাজ। এবং সম্মানজনক ভাবে জীবন কাটানোর দুটি উপায় রয়েছে— প্রথমত, নিজেদের আদর্শকে রক্ষা করার জন্য আত্মাহুতি দেওয়ার প্রস্তুতি এবং দ্বিতীয়ত, একটি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ নির্মাণ।

> ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে প্রবীণ স্বয়ংসেবকরা শুধু অংশগ্রহণই করেনি, অন্য দলের ও মতাদর্শের শীর্ষ নেতাদের ভূমিগত অবস্থায় থাকার সুষ্ঠ ব্যবস্থাও করেছিল।

এই ভাবনার ফলশ্রুতিতে তিনি সাধারণ দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ বা দেশাত্মবোধের স্তরকে উন্নত করার জন্য ব্যক্তি চরিত্রের পাশাপাশি যাতে রাষ্ট্র চরিত্রও বিকশিত হয় তার জন্য এক অভূতপূর্ব ও অনুপম শৈলীসম্পন্ন সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই অনুপম শৈলী হলো সঙ্ঘের 'নিত্য সংস্কার কেন্দ্র— শাখা'। যেখানে শিশু থেকে প্রবীণ সকলেই প্রতিদিন ১ ঘণ্টার জন্য একত্রিত হন এবং বয়সোচিত শারীরিক অনুশীলন (সূর্য নমস্কার, যোগাসন, যোগব্যায়াম, লাঠি-খেলা, নিযুদ্ধ ও অন্যান্য সহজ-সরল খেলাধূলা) এবং বৌদ্ধিক চর্চার (যেমন গান, সুভাষিতম, অমৃতবচন, প্রেরণাদায়ী কাহিনি, সমাজ, ধর্ম ও দেশ বিষয়ক চর্চা, সবশেষে প্রার্থনা) মাধ্যমে তারা অজেয় শক্তি, জ্ঞান, চরিত্র, সাহস, ধ্যেয়-নিষ্ঠা এই পাঁচটি মুখ্য গুণ নিজেদের মধ্যে বিকশিত করার নিরন্তর চেষ্টা করেন। সঙ্ঘের লক্ষ্য হলো এই নিত্য সংস্কার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সঙ্ঘবদ্ধ ও বিজয়শালিনী জাতি রূপে নিজেদের গড়ে তুলে এবং স্বধর্ম, পরম্পরা, ঐতিহ্যকে রক্ষা করে ভারতবর্ষকে পরম বৈভবশালী করা। এই হলো অতি সংক্ষেপে

সঙ্ঘ সৃষ্টির পটভূমিকা।

সুতরাং একটি বিশেষ লক্ষ্য পূরণের জন্য সঙ্ঘের স্থাপনা— এক কথায় 'ব্যক্তি নির্মাণ' বা 'ম্যান মেকিং' এবং তার মাধ্যমে 'রাষ্ট্র নির্মাণ'। এই কাজে কোনও প্রতিক্রিয়া বা হিংসার কোনও স্থান নেই। তাই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজীর একটা নীতিগত সিদ্ধান্ত ছিল যে, যে লক্ষ্য পূর্তির জন্য সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা, সঙ্ঘ নীরবে, নিভৃতে সেই সাধনা করে যাবে। সংগঠন হিসাবে সঙ্ঘ কোনও আন্দোলনাত্মক কাজে অংশগ্রহণ করবে না। স্বয়ংসেবকরা নিজস্ব অভিরুচি অনুযায়ী ব্যক্তিগত ভাবে তা করতে পারেন। যদি সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে ডাক্তারজীর পৃথক কোনও সংগঠন স্থাপনার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই তিনি তা করতে পারতেন। এবং সঙ্ঘের নীতিগত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি স্বয়ং ব্যক্তিগত ভাবে সঙ্ঘ স্থাপনার পরেও কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩১-৩২ সালে সরসঙ্ঘচালক পদ থেকে সাময়িক অব্যাহতি নিয়ে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে অন্য অনেক স্বয়ংসেবকের সঙ্গে 'জঙ্গল সত্যাগ্রহ', 'আইন-অমান্য' আন্দোলনে যোগদান করে কারাবন্দি হন।

এ সমস্ত তথ্য সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজীর যে-কোনও জীবনী গ্রন্থে বিশদে বর্ণিত হয়েছে। যে কোনও আগ্রহী ব্যক্তি তা পড়ে দেখতে পারেন। এছাড়াও ড. রাকেশ সিন্‌হা রচিত ও ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক 'ডাক্তারজী' শীর্ষক জীবনী গ্রন্থে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড ও স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে প্রচুর তথ্য রয়েছে।

ডাক্তারজীর বিভিন্ন ব্যক্তিগত চিঠিপত্র থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ বা সহযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভাবে স্বয়ংসেবকদের ভূমিকা এবং সংগঠন হিসাবে সঙ্ঘের ভূমিকা, সীমারেখা ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ও দৃঢ় নীতিগত সিদ্ধান্তের বিশদ ধারণা পাওয়া যায়। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি উদ্ধৃত করা হলো—

(দিনাঙ্ক ২১-১-১৯৩০, অধিবক্তা শ্রী নূলকরকে লেখা পত্র)

''...এই বছর 'স্বাধীনতা' নিজেদের লক্ষ্য রূপে নিশ্চিত করে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি রবিবার, ২৬-১-১৯৩০ সারা ভারতে 'স্বাধীনতা দিবস' পালনের ডাক দিয়েছে।''

''অখিল ভারতীয় কংগ্রেস সমিতি আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে উন্নীত হয়েছে দেখে আমাদের স্বভাবতই প্রচণ্ড আনন্দ হচ্ছে। স্বাভাবিক কর্তব্য রূপে আমাদের উচিত এই লক্ষ্য প্রাপ্তির উদ্দেশে অগ্রসর যে কোনও সংগঠনকে সাহায্য করা।''

''এজন্য রবিবার, ২৬-১-১৯৩০ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রত্যেক শাখায় সন্ধ্যা ঠিক ৬টায় সঙ্ঘস্থানে শাখার সকল স্বয়ংসেবক সভার জন্য একত্র হয়ে রাষ্ট্রধ্বজ অর্থাৎ গৈরিক ধ্বজকে বন্দনা করবে। ভাষণে স্বাধীনতার অর্থ এবং সেই লক্ষ্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্য যেন প্রত্যেকের জীবনে বদ্ধমূল থাকে এই ভাবনা বিশদে ব্যাখ্যা করুন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির লক্ষ্যকে সমর্থন করার জন্য কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানিয়ে কার্যক্রম শেষ করবেন।''

(দিনাঙ্ক ২৭-৭-১৯৩০ নাগপুর, কার্যকর্তাদের নিকট প্রেরিত পত্র)

কংগ্রেস সূচিত জঙ্গল সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণের জন্য যবতমাল (বিদর্ভ) যাওয়ার আগে ডাক্তারজী সঙ্ঘকার্যের জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করেছিলেন। এটাও জানিয়েছিলেন যে তাঁর অনুপস্থিতে ড. পরাঞ্জপে সরসঙ্ঘচালকের দায়িত্ব পালন করবেন। জঙ্গল সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণের সময় সঙ্ঘ এবং স্বয়ংসেবকের ভূমিকা স্পষ্ট করে ডাক্তারজী লিখেছিলেন—

''সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিষয়ে সঙ্ঘের নীতি সম্পর্কে বারবার জানতে চাওয়া হচ্ছে। এই আন্দোলনে সংগঠন হিসাবে যোগদান করার বিষয়ে সঙ্ঘ এখনও নিশ্চিত করেনি। ব্যক্তিগত ভাবে যাঁরা সম্মিলিত হতে চান, তারা সঙ্ঘচালকের অনুমতি নিয়ে তা করতে পারেন, কোনও আপত্তি নেই।

(দিনাঙ্ক ১৮-৯-১৯৩০, নাগপুর, অধিবক্তা শ্রীনূলকর (মহাকোশল))

১৯৩০-এ কংগ্রেস সূচিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতি সঙ্ঘের তরুণ স্বয়ংসেবকেরা আকৃষ্ট হয়েছিল। স্বয়ংসেবকদের এই মানসিক অবস্থার কারণে সঙ্ঘকার্যের উপর যেন কোনও প্রতিকূল পরিণাম না হয় সেজন্য আমাদের শাখার কার্যকর্তারা সচেষ্ট, এই বিষয়ে শ্রী নূলকর মহোদয়ের (সঙ্ঘচালক, বিলাসপুর) লেখা পত্রের উত্তরে ডাক্তারজী লিখেছিলেন—

''...বিলাসপুরের পরিস্থিতি দেখে আমরা কিছুটা চিন্তিত। কিন্তু আপনার পাঠানো চিঠিতে তা শুধরে যাওয়ার আশা ব্যক্ত হওয়ায় সন্তুষ্ট হলাম। চিন্তা হওয়াতেই এই পত্র লিখছি। এই আন্দোলন থেকে সঙ্ঘকার্যের কোনও ক্ষতি না হয়, এর অর্থ যেন কেউ এরকম না করে যে সঙ্ঘ আন্দোলনের বিরোধী। কিন্তু সঙ্ঘকার্যও রাষ্ট্রীয় কার্য এজন্য তা চালনা করা প্রত্যেক স্বয়ংসেবকের কর্তব্য। আমি আপনাকে আগেই জানিয়েছি যে, যেসব স্বয়ংসেবক এই আন্দোলনে যোগ দিতে চান তাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে সঙ্ঘচালকের অনুমতি নিয়েই সত্যাগ্রহে যোগ দিন। কিন্তু যাঁরা সঙ্ঘকার্যের আধারস্তম্ভ তাদের উপর সঙ্ঘ কার্য চালানোর দায়িত্ব রয়েছে। সঙ্ঘ জানে যে এই আন্দোলনের ফলে রাষ্ট্রে জাগৃতি আসবে, কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তি হবে না। জাগৃতি আসবে এজন্য সঙ্ঘ এই আন্দোলনের প্রতি বিরোধীর নয়, বরং সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেছে। সঙ্ঘের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে আমরা সহযোগিতা করব এরকম সঙ্ঘ চায় না। এরকম করাও উচিত নয়। সঙ্ঘের উপর ভীরুতার অভিযোগ নিরর্থক। সঙ্ঘের প্রত্যেক স্বয়ংসেবক স্বাভিমানী। তারা কোনও ধরনের অপমান সহ্য করবে না, এজন্য আন্দোলনের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে যাওয়া উচিত নয়। এই বিষয়ে কারও সঙ্গে বাদ-বিবাদ নিরর্থক। নিজেদের কাজ ভালো ভাবে করে আমাদের দ্বারা যতটা সম্ভব ততটা সম্পূর্ণ আন্দোলনকে সাহায্য অবশ্যই করা উচিত। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের এক-আধটা বাধা যদি আমাদের দ্বারাই দূর করা সম্ভব হয় তবে অবশ্যই তা দূর করা উচিত।''

(সূত্র : সঙ্ঘ নির্মাতা কে আপ্ত বচন, ভারতীয় বিচার সাধনা, নাগপুর, পৃ. ৫-৬)

অর্থাৎ 'সঙ্ঘ সংগঠন হিসাবে কোনও আন্দোলনাত্মক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবে না'— সঙ্ঘের এই নীতিগত সিদ্ধান্ত ডাক্তারজী বারবার নির্দ্বিধায় এবং দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। এর মধ্যে গোপনীয়তার কিছু নেই।

যে কোনও গবেষক বা নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক এসব জানেন এবং জেনে-বুঝেই তাঁরা ডাক্তারজী ও সঙ্ঘের মূল্যায়ন করেছেন। এসব শুধু আমাদের কথা নয়। ১৯৭২ সালে স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত যে সকল ব্যক্তি জাতীয় নেতা (ন্যাশনাল হিরো) হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন, ভারত সরকারের উদ্যোগে তাঁদের জীবনী রচনার দায়িত্ব মোট চার খণ্ডে কলকাতার 'ইনস্টিটিউট অব্ হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ' সংস্থাকে দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় খণ্ডে ডাক্তারজীকে একজন মহান দেশপ্রেমিক, মনীষী এবং বিপ্লবী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেসময় কেন্দ্রে 'ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে' কংগ্রেস সরকার ক্ষমতাসীন ছিল। তাঁদের নিযুক্ত ঐতিহাসিকদের সংস্থা যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতো যে ডাক্তারজীর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি বা ডাক্তারজী এবং সঙ্ঘ উভয়েই ব্রিটিশের সহযোগী ছিল--- তাহলে কি তাঁরা ডাক্তারজীকে দেশপ্রেমিক, বিপ্লবী ও সর্বোপরি জাতীয় নেতার মর্যাদা দিতেন?

এখানেই শেষ নয়। ডাক্তারজীর তিরোধানের পর ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনেও প্রবীণ স্বয়ংসেবকরা শুধু অংশগ্রহণই করেনি, বরং অন্য দলের ও মতাদর্শের শীর্ষ নেতাদের ভূমিগত অবস্থায় থাকার সুষ্ঠ ব্যবস্থা করেছিল, যেমন— সানে গুরুজী, জয়প্রকাশ নারায়ণ, অরুণা আসফ আলি প্রমুখ। এরপর অবশিষ্ট ভারত স্বাধীন হলেও গোয়া, দমন, দিউ এবং নগর হাভেলিতে পর্তুগিজ শাসন তখনও ছিল। ১৯৫৪ সালের ২ আগস্ট স্বয়ংসেবকরা দাদরা ও নগর হাভেলিকে মুক্ত করে ভারত সরকারের হাতে তুলে দেয়।

গোয়ায় স্বাধীনতা সংগ্রামেও সঙ্ঘের কার্যকর্তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। যাদের মধ্যে কয়েকজন প্রাণ দেন এবং অনেককে পর্তুগাল পুলিশের অত্যাচার সহ্য করতে হয়। অনেকে সুদূর ইউরোপের লিসবন জেলে দীর্ঘ কারাবাস ভোগ করেন। এসব সত্ত্বেও তথাকথিত সেকুলার ঐতিহাসিকরা ফাটা রেকর্ড বাজিয়ে চলেছে যে সঙ্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি।

যে দুরাত্মা, উন্নাসিকরা এই অভিযোগ করে তাদের মধ্যে সর্বাগণ্য হচ্ছে কমিউনিস্টরা। এখন স্বাধীনতা আন্দোলন ও চীন-ভারত যুদ্ধের সময় কমিউনিস্টদের কী ভূমিকা ছিল তা জানার জন্য শান্তনু সিনহার লেখা— 'ওরা শুধু ভুল করে যায়' বা 'The great betrayers' বইটি অল্পের উপর যথেষ্ট। কমিউনিস্টরা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বা চীন-ভারত যুদ্ধের সময় জঘন্য ভূমিকা পালন করেও এদেশের গণতান্ত্রিক উদারতার কারণে এই বিজাতীয়, বিশ্বাসঘাতকরা জলজ্যান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং টিভি চ্যানেলে মুখ দেখিয়ে সঙ্ঘের মতো সংগঠনের বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়ার দুঃসাহস দেখাচ্ছে এ বড়ই হাস্যকর। আর সে সমস্ত বঙ্গীয় উন্নাসিক বুদ্ধিজীবী এই বিজাতীয়, বিশ্বাসঘাতক কমিউনিস্টদের এই বাংলার গদিতে প্রায় ৩৫ বছর ধরে নির্বিবাদে সহ্য করেছেন, তাদের প্রভাব বাড়াতে সাহায্য করেছেন, সহজ, সরল সাধারণ বাঙালিদের মধ্যে তাদের বিজাতীয় ভাবনার প্রচার-প্রসার করেছেন (কবিতা, নাটক, চলচ্চিত্র, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে) এবং অবশ্যই তার বিনিময়ে সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা জগতে নিজেদের মৌরসিপাট্টা কায়েম করে রসে-বশেই থেকেছেন, সত্যিই কি তাদের সঙ্ঘের মতো সংগঠনকে Charaeter Certificate দেওয়ার বিন্দুমাত্র নৈতিক অধিকার আছে? ব্যাপারটা অনেকটা রম্ভা কর্তৃক দেবী সীতার, সতী অনসূয়ার বা সাবিত্রীর Character Certificate প্রদানের মতো হয় না কি? ▮

# শ্বশুরবাড়ির নিয়ম

একটি মেয়ে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি এল। শ্বশুরবাড়িতে স্বামী ও শাশুড়ি ছাড়া তার এক দিদিশাশুড়ি অর্থাৎ তার শাশুড়ির শাশুড়ি থাকতেন। মেয়েটি বউ হয়ে এসে দেখল বাড়িতে তার শাশুড়ি দিদিশাশুড়িকে খুব অনাদর ও অসম্মান করে। কথায় কথায় গালিগালাজ করে আঘাত দেয়। তাই দেখে বউটির খুব খারাপ লাগত এবং দুঃখ পেত। মেয়েটি ভাবল , সে যদি শাশুড়িমাকে ঠাকুমার প্রতি খারাপ ব্যবহার করতে নিষেধ করে তাহলে তার প্রতিও সেকরম ব্যবহার করতে পারে। তাই শাশুড়িমাকে কিছু না বলে একটা উপায় বের করল। প্রতিদিন সংসারের কাজকর্ম করার পর সে দিদিশাশুড়ির কাছে বসে পা টিপে দিতে দিতে গল্প করত। তার শাশুড়িমার এসব পছন্দ হতো না। একদিন বলল, তুমি ওখানে বসবে না। বউ উত্তর দিল— কেন মা, কোনও কাজ আছে নাকি? শাশুড়িমা বলল, না কোনও কাজ নেই। তুমি ওখানে বসবে না। বউমা বলল, আমার বাবা বলেছেন, ঘরে বয়স্ক মানুষ থাকলে তাঁর কাছে বসে শিক্ষা নেবে আর তার সেবা করবে। এ বাড়িতে বয়স্ক মানুষ ঠাকুমা। তাই তাঁর কাছে বসি। আমার বাবা বলে দিয়েছেন যে, শ্বশুরবাড়িতে বাপের বাড়ির নিয়ম ফলাবে না, শ্বশুরবাড়ির যা নিয়ম সেই রকম পালন করবে। আমাকে তো এবাড়ির নিয়ম-কানুন শিখতে হবে, তাই ঠাকুমাকে

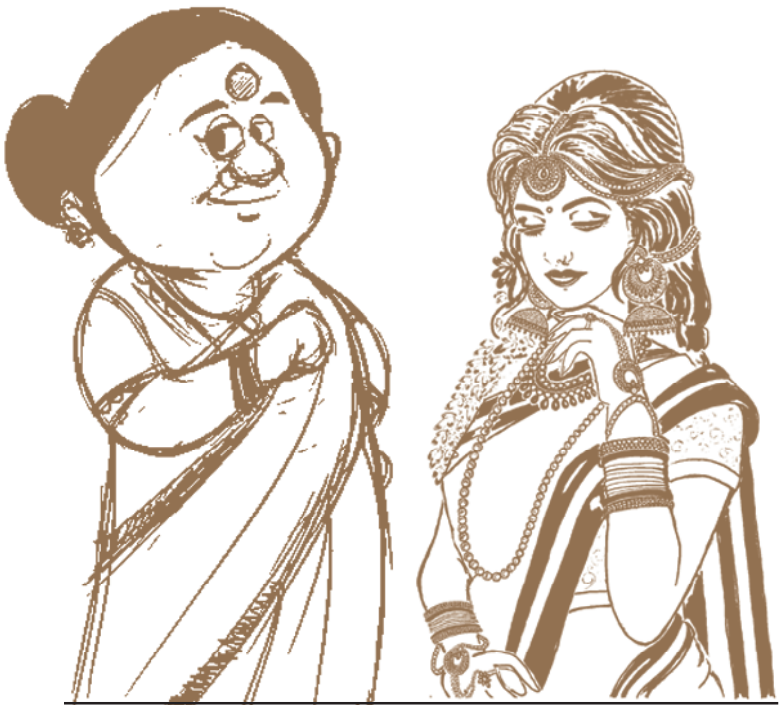

জিজ্ঞাসা করছিলাম যে, তোমার শাশুড়ি তোমার কেমন সেবাযত্ন করেন? ঠাকুমা বলল, আমার বউমা যেদিন আমাকে অপমান-অসম্মান করে না, সেদিন মনে করি উনি আমার সেবা করলেন। আমার বাবা বলেছেন বড়োদের কাছে বসে শিখতে, তাই শিখছি।

শাশুড়ি ভয় পেয়ে গেল। ভাবল আমি আমার শাশুড়ির সঙ্গে যে ব্যবহার করব সেই ব্যবহারই আমার বউমা আমার সঙ্গে করবে। উঠোনের এক কোণে ভাঙা মাটির কয়েকটা পাত্র পড়েছিল। শাশুড়ি জিজ্ঞেস করল, বউমা মাটির ভাঙা পাত্রগুলি এখানে জমা করে রেখেছ কেন? বউ বলল, আপনি রোজ মাটির পাত্রে ঠাকুমাকে খেতে দেন, আমি আপনার জন্য তাই ওগুলি রেখে দিয়েছি। শাশুড়ি বলল, তুমিও আমাকে ভাঙা মাটির পাত্রে খেতে দেবে নাকি? বউ বলল, বাবা বলেছেন, শ্বশুরবাড়ির যা নিয়ম তাই করতে হবে। শাশুড়ি বলল, এটা মোটেই নিয়ম নয়। থালা মাজার লোক নেই, তাই মাটির পাত্রে দেওয়া হয়। বউ বলল, আমি থালা মেজে দেব।

এখন থেকে ঠাকুমাকে থালাতে খেতে দেওয়া শুরু হলো। কিন্তু সবার খাওয়া হয়ে গেলে যে এঁটোকাঁটা পড়ে থাকত ঠাকুমাকে তাই দেওয়া হতো। বউ একদিন সেই এঁটোকাঁটা ভর্তি থালাটি ভালো করে দেখছিল। শাশুড়ি বললেন, কী দেখছ? বউ বলল, বড়োদের কীরকম খাবার দিতে হয় সেটা দেখছি। শাশুড়ি বলল, এটা কোনও নিয়ম নয়। আগে খাবার দেওয়ার লোক নেই, তাই শেষে খাবার শেষ হয়ে যাওয়ায় ওরকম দেওয়া হয়। বউ বলল, আমিই আগে ঠাকুমাকে খেতে দিতে পারি। এরপর থেকে ঠাকুমা প্রতিদিন আগেই ভালো খাবার পেতে শুরু করল।

ঠাকুমা নাতবউকে মনে মনে খুব আশীর্বাদ করতে লাগল। তিনি সারাদিন একটা ভাঙা খাটে শুয়ে থাকতেন। বউটি একদিন খাটটি খুব ভালো করে দেখছিল। শাশুড়ি জিজ্ঞেস করল, কী দেখছ? বউ বলল, দেখছিলাম বড়োদের কীরকম খাটে শুতে দিতে হয়। শাশুড়ি বলল , কিনতে যাওয়ার লোক নেই, তাই ভাঙা খাটে শুতে দেওয়া হয়েছে। বউ বলল, আপনি বললে আমি নতুন খাট কিনে এনে দিতে পারি। ঠাকুমার জন্য নতুন সুন্দর খাট আনা হলো।

একদিন বউ দিদিশাশুড়ির পরনের কাপড়টি খুঁটিয়ে দেখছিল। শাশুড়ি জিজ্ঞেস করল, কী দেখছ? 'বয়স্কদের কীরকম কাপড় পরতে দেওয়া হয় তাই দেখছিলাম'— বউ উত্তর দিল। শাশুড়ি বলল, ভালো কাপড় ওকে কে পরিয়ে দেবে? 'আমি পরিয়ে দেব'— বউ বলল।

বউয়ের বুদ্ধিতে ঠাকুমা ভালো খাবার, কাপড়, বিছানা,চাদর সব পেল। ঠাকুমার অনাদর, লাঞ্ছনা-গঞ্জনার অবসান হলো। যদি বউটি শাশুড়িকে উপদেশ দিতে যেত তাহলে শাশুড়ি মোটেই তার কথা শুনত না। তাই মেয়েদের উচিত শ্বশুরবাড়িতে বুদ্ধির সঙ্গে সব সমস্যার সমাধান করা।

**(সংগৃহীত)**

## ভারতের পথে পথে

# শ্রীকালহস্তী

তিরুপতি-তিরুমালাই থেকে ৩৭ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে দুই পাহাড়ের মাঝে কালহস্তী তীর্থক্ষেত্র অবস্থিত। স্বর্ণমুখী নদীর তীরে ভেল্লিকোণ্ডা পাহাড়ের দক্ষিণ পাদদেশে পল্লব রাজাদের তৈরি এটি প্রাচীন শিবমন্দির। মন্দিরের সুউচ্চ গোপুরম্‌টি কিন্তু বিজয়নগর রাজাদের দ্রাবিড়ীয় শৈলীতে গড়া। ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত কালহস্তীশ্বরা মন্দিরে শিব এখানে বায়ুলিঙ্গম্ অর্থাৎ দীপশিখা রূপে অবিরাম কাঁপছে। জনশ্রুতি, শিব এখানে মাকড়সা, নাগ ও হস্তী দ্বারা পূজিত হন। স্থানীয় ভাষায় শ্রী-র অর্থ মাকড়সা। নামটিও তাই শ্রীকালহস্তী। শিবরাত্রিতে ধুমধাম সহকারে উৎসব হয়। স্বর্ণমুখী নদী আর পূর্বঘাট পর্বতমালা এখানকার পরিবেশকে অপূর্ব সুন্দর করে তুলেছে। এখানকার কলমকারী হ্যান্ডপ্রিন্ট বস্ত্রের খ্যাতি পৃথিবী বিখ্যাত।

## জানো কি?

- জন-গণ-মন হলো জাতীয় স্তোত্র এবং বন্দে মাতরম্ হলো জাতীয় সংগীত।
- অশোকচক্রে ২৪টি অক্ষ রয়েছে।।
- রাষ্ট্রীয় ধ্যেয়বাক্য হলো 'সত্যমেব জয়তে'।
- বন্দে মাতরম্ সংগীত বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসের অন্তর্গত।
- ভারতের জাতীয় খেলা হলো হকি।
- জাপানের জাতীয় খেলা জুডো।।
- ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় খেলা ক্রিকেট।

## ভালো কথা

# বাঁকুড়ায় বান

সেদিন হঠাৎ প্রবল বৃষ্টিতে আমাদের গন্ধেশ্বরী নদীতে বান এসে গেল। গত বছর এরকম বানে সতীঘাটে দু'জন ভেসে গিয়েছিল। তাই আমরা সারাদিন পালা করে দাঁড়িয়েছিলাম কেউ যাতে নদী না পেরোয়। ওদিকে খবর এল জুনবেদিয়াতে পাড়ার মধ্যে বান ঢুকেছে। বড়োদের কয়েকজন তখনই ছুটে গেল জুনবেদিয়ায়। আমরা খবর পেলাম ওখানে একটা বড়ো বাড়ি ভেঙে পড়েছে। দু'দিন পরে জল নেমে গেলে সারা পাড়ায় আমরা ব্লিচিং ছড়িয়েছি। তপনদা বলেছেন , প্রতি বছর বন্যার সময় আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

**প্রলয় সেন, অষ্টমশ্রেণী, ঘটকপাড়া, বাঁকুড়া।**

*তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।*

## শব্দের খেলা

| *লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে* | *সঠিক ভাবে সাজাতে হবে* |
|---|---|
| (১) ণ বি র জ তো | (১) ক স্ব ব য় ং সে |
| (২) র ভা কু সু ঠা | (২) ণ ক্ষ য় মা রা প |

**১৩ আগস্ট সংখ্যার উত্তর**

(১) হিতাহিতজ্ঞানহীন (২) সর্বধর্মসমন্বয়

**১৩ আগস্ট সংখ্যার উত্তর**

(১) নিবেদিতপ্রাণ (২) বন্দে মাতরম্

**উত্তরদাতার নাম**

(১) শঙ্খশুভ্র দাশ, সোনারপুর, দঃ ২৪পরগনা। (২) রূপষা দেবনাথ, বিরাটি, কলকাতা- ৪৯ (৩) শুভ চৌহান, তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, উঃ দিনাজপুর। (৪) অরিত্র নন্দ, এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর।

*সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।*

**উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়**

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
*ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।*
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

# ।। চিত্রকথা।। অভিমন্যু।। ২৩

*কিছুক্ষণের মধ্যেই অভিমন্যুর এক শরাঘাতে দুঃশাসন রথে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন।*

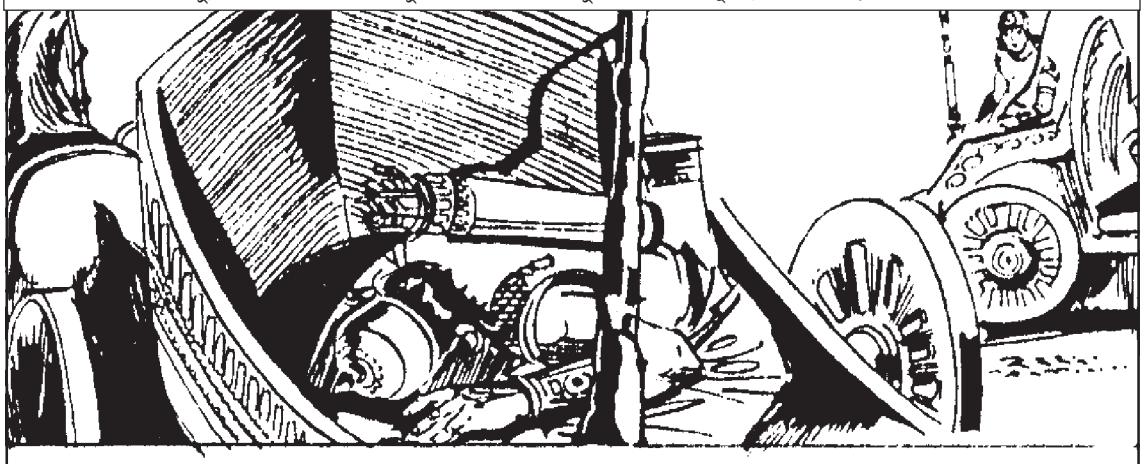

*দুঃশাসনের সারথি দ্রুত রথ নিয়ে সরে যায়।*

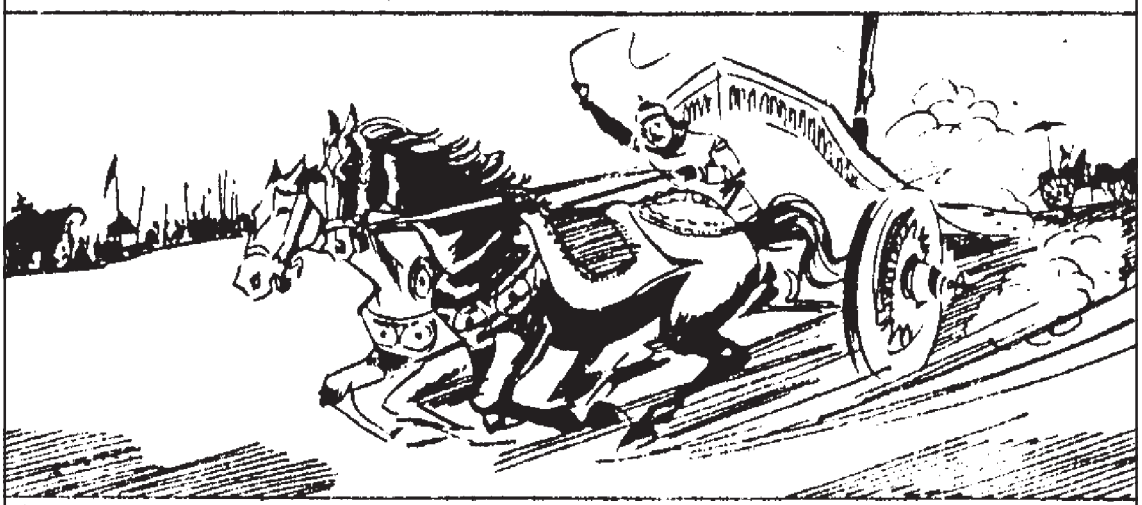

*এরপর আসেন কর্ণ। দারুণ যুদ্ধ শুরু করেন।*

# স্মরণে-মননে এশিয়াড প্রাক্তন তারকার চোখে

**জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়**

যে কোনো এশিয়াডের কথা বললেই মনে পড়ে যায় সেই ১৯৬২-র জাকার্তা এশিয়াডের কথা। সে সময়ে ভারতীয় ক্রীড়া ও শরীরচর্চার অন্যতম প্রধান সংগঠক গুরুদত্ত সোন্ধীর এক বিতর্কিত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেঁধে যায় জাকার্তায়। প্রবল ভারত বিরোধিতার মধ্যেও ফুটবল দল অবিস্মরণীয় পারফরমেন্স মেলে ধরে। সফল হয়েছিলেন হকি তারকা, অ্যাথলিটরাও। এখন আবার সেই জাকার্তায় চলছে এশিয়ান গেমস। তিন প্রাক্তন তারকার অনুভূতিতে উঠে এল এশিয়াডের স্মৃতি।

**গুরুবক্স সিংহ, প্রাক্তন আন্তর্জাতিক হকি তারকা :** ১৯৫৮ সালে প্রথম এশিয়ান গেমসে হকি অন্তর্ভুক্ত হয়। ৫৮,৬২-র এশিয়াডে পাকিস্তানের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। ৬৬-র ব্যাঙ্কক এশিয়াডে আমার নেতৃত্বে ভারত প্রথম স্বর্ণপদক জেতে। পাকিস্তান তুল্যমূল্য লড়েও ভারতের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তখন ভারত বিশ্ব হকির মঞ্চে একপ্রকার অপরাজেয় ছিলই। কিন্তু কেন জানি না, এশিয়াডে পর পর দু'বার পাকিস্তান টেক্কা দিয়ে যায়। ব্যাঙ্কক এশিয়াডে সোনা জেতার পর এশিয়ান গেমসের বিজয়মঞ্চে গিয়ে দাঁড়াবার পর এক অদ্ভুত আনন্দ ও অনুভূতিতে গোটা মন-প্রাণ ভরপুর হয়ে উঠেছিল। থাইল্যান্ডের ভারতীয় সমাজ বিরাট সংবর্ধনা দিয়েছিল। দেশে ফিরে আসার পর ভারতীয় হকি ফেডারেশন ও রাজ্যের কংগ্রেস সরকারও নাগরিক সংবর্ধনা দিয়েছিল। গোটা টুর্নামেন্টে আমি ও সহযোগী ডিফেন্ডার গ্রেট পৃথ্বীপাল সিংহ যে জমাট ডিফেন্স গড়ে তুলি, তাতে ফাটল ধরতে পারেনি দুরন্ত ও গতিশীল পাক আক্রমণভাগ। তখন মালয়েশিয়া, জার্মান, দক্ষিণ কোরিয়া এত শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি। এই তিন দেশকে হারাতে তাই বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। ফাইনালে পাকিস্তানকে হারানো আমার জীবনে বড় মুখ করে বলার মতো সাফল্য গরিমা।

এশিয়ান গেমস্ - ২০১৮-র প্রথম সোনাজয়ী ভারতীয় বক্সার পুনিয়া।

**প্রদীপ (পি কে) বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রাক্তন ফুটবল তারকা, কোচ),** ১৯৬২-র জার্কাতা এশিয়াডে ফাইনালে জয়সূচক গোলটি ছিল আমার। জীবনে বহু স্মরণীয় আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছি দেশে বিদেশে। কিন্তু ওই এশিয়াডের ফাইনালে শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে যে খেলাটা খেলেছিলাম তার কোনো বিকল্প নেই। গ্রুপের খেলায় দক্ষিণ কোরিয়া ভারতকে হারিয়ে দিয়েছিল। তাই ফাইনালে শোধ তোলা এবং দর্শক বিরোধিতার জবাব দিয়ে দেশকে গৌরবান্বিত করার গুরুদায়িত্বও ছিল। আমি, চুনী গোস্বামী ও তুলসীদাস বলরামকে নিয়ে গড়া ভারতীয় আক্রমণকে তখন এশিয়ার সব দেশ বাড়তি সমীহ করত। তিনজনকে ম্যান ও জোনাল মার্কিং করেও আটকানো যেত না। দক্ষিণ কোরিয়া রাফ অ্যান্ড টাফ ফুটবল খেললেও আমাদের মনে ভয় ধরাতে পারেনি। পিছন থেকে মাঝে মধ্যে উঠে এসে বলশালী ডিফেন্ডার জার্নেল সিংহ ও রহমান পাল্টা রাফ অ্যান্ড টাফ খেলে কোরিয়ানদের মোক্ষম জবাব দিয়েছিলেন। জার্নেল হেড করতে গিয়ে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারের সঙ্গে সংঘর্ষে চোট পেয়ে, মাথায় ফেট্টি বেঁধেও যে লড়াইটা তুলে ধরেছিলেন, তা এখনও মনে পড়লে এই ৮৩ বছরের বৃদ্ধও শিহরিত হয়ে ওঠে।

**জ্যোতির্ময়ী সিকদার (প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন অ্যাথলিট) :** ১৯৯৮-এর ব্যাঙ্কক এশিয়ান গেমস আমাকে নবজন্ম দিয়েছিল। ওই বড় ইভেন্টের আগে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক মিটে সাফল্য-ব্যর্থতা হাত ধরাধরি করে এসেছিল। কিন্তু সমালোচকদের মন জয় করতে পারিনি কোনোভাবেই। এমনকি রাজ্য ও জাতীয় স্তরের অ্যাথলেটিক্স কর্তারাও আমার বিরুদ্ধে ইতি-উতি আলটপকা মন্তব্য ছুঁড়ে দিত যে জ্যোতির্ময়ী ফিনিশ, কেন ওকে জাতীয় দলে নেওয়া হচ্ছে। আমি তাই একপ্রকার জেদ নিয়েই পাতিয়ালার সাই সেন্টারে জাতীয় ক্যাম্পে গিয়েছিলাম এই ভেবে যে 'নাউ অর নেভার'। এবার না হলে আর হবে না। এই ব্যাঙ্কক এশিয়াড আমার অগ্নিপরীক্ষা। আমাকে সোনার পদক জিতে গোটা দেশে আলোড়ন ফেলে দিতে হবে। আর হলোও তাই। ৮০০ ও ১৫০০ মাঝারি পাল্লার দৌড়ে সবার আগে টার্গেটে পৌঁছে কয়েক সেকেন্ডের জন্য বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। প্রথম ভারতীয় মহিলা রানার হিসেবে এশিয়াডে জোড়া সোনাজয়ী, অবিশ্বাস্য, অবিস্মরণীয় ঘটনা বলে মনে হয়েছিল। গোটা স্টেডিয়াম ৫ মিনিট ধরে হাততালি দিয়েছিল। দর্শকদের মধ্যে এশিয়ার সব দেশের নাগরিকরাও ছিলেন। অসাধারণ এক রেস হয়েছিল। চীন, কোরিয়া, জাপান, ইরান, কাজাখাস্তান, থাইল্যান্ডের দৌড়বীররাও অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বিশেষ করে ১৫০০ মিটারে বাকি সাতটি দেশের প্রতিযোগীরা যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন প্রতিটি টার্নিংয়ে তা অতিক্রম করে চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি আদায় করাটা আন্তর্জাতিক কীর্তি বলে মনে হয়েছিল।

# স্বস্তিকা

## পূজা সংখ্যা : ১৪২৫

**মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে**

*পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা*

### দেবী প্রসঙ্গ

স্বামী যুক্তানন্দ

### উপন্যাস

শেখর সেনগুপ্ত - অবেক্ষণ।। সুমিত্রা ঘোষ— কুসুম কুমারী
জিষ্ণু বসু—হাতি ঘোড়া পাল কী

### উপন্যাসোপম কাহিনি

প্রবাল চক্রবর্তী - মাতৃরূপেণ সংস্থিতা

### গল্প

এষা দে, রমানাথ রায়, শেখর বসু, সিদ্ধার্থ সিংহ, সন্দীপ চক্রবর্তী
গোপাল চক্রবর্তী, তাপস অধিকারী

### ভ্রমণ

কুণাল চট্টোপাধ্যায়— রেনেসাঁর ভূমিতে

### প্রবন্ধ

অচিন্ত্য বিশ্বাস, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, সারদা সরকার, সুদীপ বসু,
অভিজিৎ দাশগুপ্ত, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ণব নাগ

**আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা**

# মার্কস্‌বাদ অথবা বুর্জোয়া গবেষণাগারে বানানো সর্বহারার টনিক

দেবাশিস লাহা

(তৃতীয় পর্ব)

আসুন আপনাদের দুজন মানুষের গল্প বলি— নিজের চোখে দেখা। প্রথমজন আমার পিসেমশাই। আমার চেনা গণ্ডির মধ্যে তিনিই প্রথম বুর্জোয়া। উত্তরবঙ্গের মানুষ। পথে ঘাটে যত বাস ট্রাক দেখা যেত তার সিংহভাগের মালিক তিনি এবং তাঁর একমাত্র ভাই। শুধু বাস লরি নয়, বেশ কিছু রাইস মিল, ইট ভাঁটার মালিক। কী দাপট। তাঁর অধীনে কয়েক শো' কর্মচারী কাজ করত। ভয়ে তটস্থ থাকত। নিজের চোখে তাঁর অত্যাচার দেখেছি। ধনসম্পত্তি আর প্রতাপের বলে তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করতেন। কথা বললেই মনে হতো গর্জন করছেন। বজ্রের মতো কণ্ঠস্বর। হাবভাব চলা ফেরা সব কিছুতেই আভিজাত্য, কিন্তু অত্যাচারী সত্তাটি মাঝে মধ্যেই প্রকাশিত হতো।

এই দোর্দণ্ড প্রতাপ বুর্জোয়াটির বাড়িতে একদিন ভয়াবহ ডাকাতের দল হানা দিল। আচম্বিতে গুলির লড়াই চলল। তাঁর ভাই নিহত হলেন। এক ডাকাতও মারা পড়ল। বাকিরা পালিয়ে গেল। যাওয়ার আগে অবশ্য সিন্দুকটি ফাঁকা করতে ভোলেনি। ভাইয়ের মৃত্যুর পর পিসেমশাইয়ের ব্যবসা পড়তে লাগল। যেহেতু তিনিই বিজনেসের ব্রেইন ছিলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই পিসেমশাই দেউলিয়া হয়ে গেলেন। তবু তাঁর মেজাজ কমল না। বাস লরি সব দেনার দায়ে চলে গেল। অবশেষে একটি মুদির দোকান খুলে ফেললেন। হাটের মধ্যে। দেখলে কষ্ট হতো। তাও চলল না। অবশেষে একটি দোকানের কর্মচারী হয়ে গেলেন। পেটের দায়ে। তারপর অবশ্য বেশিদিন বাঁচেননি। আপনারা এর কী ব্যাখ্যা করবেন? বুর্জোয়া থেকে একজন মানুষ প্রলেতারিয়েত হয়ে গেল?

হ্যাঁ, মার্কস সাহেবের মতে তাই। কারণ উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তি তথা মালিকানার ব্যাখ্যায় তিনি তখন সর্বহারা। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তিনি কিন্তু বুর্জোয়াই রয়ে গেলেন। আমৃত্যু। আর একজন মানুষ। আমার পাড়ায় থাকতেন। লেদ মেশিনের কারখানায় কাজ করতেন। শাসক দলের সঙ্গে জুটে গিয়ে রাতারাতি কয়েক কোটি টাকার মালিক হয়ে গেছেন। তাঁর অধীনে এখন ডজন ডজন কর্মচারী। এমন চরিত্র আপনারাও দেখছেন অহরহ। এর কী ব্যাখ্যা? সর্বহারাও তবে বুর্জোয়া হয়ে ওঠে। তাই তো? মূল বিষয়টিই মার্কস সাহেব অস্বীকার করেছেন— সেটি হলো প্রতিটি মানুষ মনে মনে 'বুর্জোয়া'। সে সব সময় দখল করতে চায়। প্রেমিক হলে ভালোবাসার মানুষটির উপর দখল, রাজা হলে রাজ্যের উপর দখল। এই দখলদারির মানসিকতা দিয়েই আমরা পৃথিবীর পশু পাখিদের নিরন্তর উদ্বাস্তু করে চলেছি। তাই দৃশ্যগত ভাবে যতই বুর্জোয়া প্রলেতারিয়েতের ভাগ করি না কেন, মনে মনে সবাই বুর্জোয়া। সুযোগের অপেক্ষায় থাকি। তাই মালিক বা শ্রমিক কোনো স্থিতিশীল অবস্থা নয়, আজ যে মালিক কাল সে শ্রমিক হতে পারে, আজকের শ্রমিক আগামীর মালিক হতে পারে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে নিহিত এই প্রভুত্বের মননটি ঠিক কোন পর্যায়ে যেতে পারে, সে ব্যাপারে একটি বহু পুরনো বাংলা প্রবাদ বাক্য আছে— যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। মার্কসবাদের সবচেয়ে বড় ত্রুটিটি সম্ভবত অতি সরলীকরণ। পিওর সায়েন্সের ল্যাবরেটরিতে মানুষের জীবন-যাপন বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা বাতুলতা। ফর্মুলা দিয়ে অ্যালজেবরা যত সহজে সমাধান করা যায়, জীবনের সম্পাদ্য, উপপাদ্য তত সহজ নয়। রাষ্ট্রের চরিত্র কেমন— সামন্ততান্ত্রিক না আধা সামন্ততান্ত্রিক আধা ঔপনিবেশিক নাকি বিশুদ্ধ ধনতান্ত্রিক ইত্যাদি শ্রেণীবিভাগ কখনও পদার্থ বিদ্যার সমীকরণের মতো অভিন্ন হতে পারে না। মতভেদ অনিবার্য। এদেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কেউ ধনতান্ত্রিক ছাপ্পা লাগিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নিদান দিয়েছেন, কেউ আবার আধা সামন্ততান্ত্রিক আধা ঔপনিবেশিক ক্যাটাগরিতে ফেলে জনগণতান্ত্রিক তথা কৃষি বিপ্লবের ডাক দিয়েছেন। ফলশ্রুতি হিসেবে মার্কসবাদী দলগুলি অসংখ্য ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। কেউ মার্কসবাদী লেনিনবাদী, কেউ মাওবাদী, কেউ আবার শুধুই মার্কসবাদী। সব দলই নিজেদের অভ্রান্ত বলে দাবি করে থাকে এবং মাঝে মধ্যেই পরস্পরের সঙ্গে সহিংস বিবাদেও জড়িয়ে পড়ে।

অন্ধ্র প্রদেশ, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড ইত্যাদি রাজ্যে একাধিক নকশালপন্থী ফ্র্যাকশন পরস্পরকে হত্যা করেছে। বাম শাসনের শেষ দশ বছরে বেশ কিছু সিপিআইএম কর্মী এ রাজ্যেও মাওবাদীদের হাতে নিহত হয়েছেন। বুর্জোয়া প্রোলেতারিয়েত শ্রেণীবিভাগটি করবার সময় এমন শব্দচয়ন করা হয়েছে। পড়ে মন হবে বুর্জোয়া মাত্রেই লোভী, শয়তান এবং অসাধু, আর সর্বহারা মানেই ধোয়া তুলসীপাতা। বাস্তবে কি তাই? মানুষকে এভাবে সরলীকরণ করা আর যাই হোক অভ্রান্ত দর্শন হতে পারে না। আমি অনেক হাড় বজ্জাত সর্বহারা দেখছি— এরা সুযোগ পেলে করতে পারে না এমন কাজ নেই। এদের মধ্য থেকেই তো আজকাল নেতা, প্রোমোটার, সিন্ডিকেট গুরুর সাপ্লাই হচ্ছে। মধ্যবিত্ত বরং সম্পদবৃদ্ধি করতে পারছে না। একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার তালিকার

সবাই এই ক্যাটাগরি। একেই কি শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী চেতনা বলবেন? বুর্জোয়া মানেই সবাই রক্তচোষা, অসাধু? রবীন্দ্রনাথ? টলস্টয়? এমনকী বিল গেটস যিনি তার উপার্জিত অর্থের সিংহ ভাগ সমাজ সেবায় লাগিয়েছেন? অতি সরলীকৃত উৎপাদন সম্পর্ক দিয়ে আর যাই হোক মানব চরিত্রের বিচার করা যায় না। আর ঠিক এই কারণেই বিশ্বের সমস্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি ভেঙে পড়েছে। শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন দেখিয়ে তৈরি হয়েছে আর এক নতুন ধরনের শোষক। লাল রঙের আড়ালেও তাকে দিব্যি চীনে নেওয়া যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন তো শেষ। আসুন এবার চীনে কী চলছে দেখে নেওয়া যাক। ২০১২ সালে Guardian নামক এক সুবিখ্যাত বুর্জোয়া পত্রিকায় কলামনিস্ট স্টুয়ার্ট জেফ্রিজ একটি আর্টিকল লেখেন— Why Marxism is on the rise again। মার্কসবাদের নাকি উত্থান হচ্ছে, সেই মর্মে কিছু তথ্য দিতে গিয়ে বেশ চাপে পড়েই তাঁকে Jacques Ranciere নামক এক ফরাসি পর্যবেক্ষক তথা তাত্ত্বিকের উক্তি তুলে ধরতে হয়েছে—

"The domination of capitalism globally depends today on the existence of a Chinese Communist party that gives de-localised capitalist enterprises cheap labour to lower prices and deprive workers of the rights of self- organisation."

আসুন, প্রাঞ্জল করে বুঝে নিই। সমগ্র বিশ্বের ধনতন্ত্রের কর্তৃত্ব এখন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির উপর নির্ভর করে আছে। কারণ বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক উদ্যোগগুলিতে সস্তা শ্রমিকের জোগান দেওয়ার বন্দোবস্ত এঁরাই করেছেন। উদ্দেশ্য অবশ্যই ভোগ্যপণ্যের দাম কমানো। এর ফলে খোদ শ্রমিকেরাই বঞ্চিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, তাঁদের কোনো সংগঠন করার অধিকার পর্যন্ত নেই, আত্ম নিয়ন্ত্রণ তো দূরের কথা।

অর্থাৎ সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের নাম করে আর একটি শোষণ নির্ভর সমাজব্যবস্থার সূত্রপাত। যার পরিণতি সেই তিয়েন-আন-মেনের জমায়েতের উপর ট্যাঙ্ক চালিয়ে দেওয়া। স্তালিন জমানার অত্যাচার, নিপীড়নের কথা আপনাদের জানা। এ নিয়ে আমিও কম লিখিনি। লর্ড অ্যাক্টনের সেই অবিস্মরণীয় উক্তিটি মনে পড়ছে— "Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men."

"ক্ষমতার ধর্মই হলো দুর্নীতির দিকে ঠেলে দেওয়া— আর চরম ক্ষমতা মানেই চরম দুর্নীতি। পৃথিবীর মহান মানুষদের প্রায় সবাই মন্দ মানুষ।"

চমকে উঠলেন তো! উত্তেজিত হবেন না। এখানে গ্রেট ম্যান মানে শিল্পী সাহিত্যিক অর্থাৎ রবি ঠাকুর, টলস্টয়কে বোঝানোয় হয়নি। এক্টন সাহেব ক্ষমতাধরদের বুঝিয়েছেন— লেনিন, স্তালিন, হিটলার, মুসোলিনি— যারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নয়, গায়ের জোরে ক্ষমতা দখল করেছেন। কারণ ক্ষমতা দখল করার পর তা বজায় রাখতে চরম দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হয়। আর অধিপত্যের আফিম যে কত ভয়ঙ্কর আপনারা কম বেশি জানেন। মার্কসীয় সমাজতন্ত্র যেহেতু সর্বহারার একানায়কত্বকেই ধ্রুব সত্য মনে করে, এই ব্যবস্থার ফল কী হতে পারে বোঝার জন্য পণ্ডিত হওয়ার দরকার পড়ে না। একনায়ক মানেই চরম ক্ষমতার অধিকারী। আর চরম ক্ষমতা করায়ত্ত হলে কী হতে পারে লর্ড অ্যাক্টন আগেই বলে রেখেছেন।

অনেকের পক্ষেই মেনে নেওয়া অসম্ভব হবে মার্কসবাদ সমসাময়িক ব্রিটেনের ইন্ধনেই পল্লবিত এবং বিকশিত হয়েছে। কারণ তাঁরা এখনও এই স্বপ্নটিতে বিশ্বাস রাখেন। তাঁদের আবেগ যথাযথ। অনস্বীকার্য যে মার্কসবাদ একটি দর্শন। আবার এটিও সত্যি যে দেকার্ত, স্পিনোজা অথবা হিউমের মস্তিষ্কজাত দর্শনগুলির সঙ্গে এর একটি মূলগত ফারাক আছে। কারণ মার্কসবাদ নিছক জীবন ও জগতের রহস্য উন্মোচনের তাগিদে রচিত কোনো সমাজ দর্শন নয়, এটি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের দর্শন। অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে ইসলামের মূলগত পার্থক্যটিও একই রকম। যাক সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। আমি এখানে একটি প্রশ্ন/ভাবনা রেখেছি, যা মার্কসবাদের অধ্যয়ন থেকেই উৎসারিত। সর্বহারার ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত এই দর্শনটির অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়ই হলো, ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না! এই ওরা কারা? নিশ্চয় সাধারণ মানুষ নয়। আপনি আমি সবাই জানি এই 'ওরা' হলো বুর্জোয়া শ্রেণী তথা তাদের তাঁবেদার গোষ্ঠী যারা যন্ত্রটি দখল করে রেখেছে। কিন্তু ধনতন্ত্রের হেড কোয়ার্টারে বসে একটি পাখি গানের পর গান গেয়ে গেল এবং প্রতিটি গান 'ওরা'র বিরুদ্ধে। প্রশ্ন জাগবে না? জাগতে বাধ্য! সেই কৌতূহল থেকেই এই পোস্ট। তবে মার্কসবাদীদের এই বক্তব্য তুলে নিতে হবে। বলতে হবে বুর্জোয়ারা দিব্যি গান গাইতে দেয়, এখনও দিচ্ছে। বরং লেনিন স্তালিনের জমানাতেই ইচ্ছেমতো গান গাওয়া যায় না। বোঝাতে পারলাম কি? খুব সোজা, বুর্জোয়া গণতন্ত্রে বসে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লেখা যায়, গান গাওয়া যায়, কিন্তু সমাজতন্ত্রে বসে সেই ব্যবস্থাটির বিরুদ্ধে একটি শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করা যায় না। এই পর্যবেক্ষণটি মেনে নিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। দিনের পর দিন অত্যাচারী রক্তচোষা বুর্জোয়া বলে শাসক শ্রেণীটিকে গালিগালাজ করা হয়, অথচ তাদের এই মহানুভবতা স্বীকার করতে দ্বিধা কেন?

এবার একটি সবিনয় প্রশ্ন— আপনি কি মনে করেন এই মতবাদের মাধ্যমে অভীষ্ট লাভ হতে পারে। এতগুলো সমাজতান্ত্রিক দেশের ধারাবাহিক ব্যর্থতার পরেও। এই মুহূর্তে এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলি ছাড়া মার্কসবাদ, লেনিনবাদের তেমন উপস্থিতিই নেই। ইউরোপ আমেরিকা এমনকী সমাজতন্ত্রের আঁতুড়ঘর রাশিয়াতেও এর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কারণ স্পষ্ট। অশিক্ষা এবং দারিদ্র্যই এই মতবাদের বীজতলা। তাই উন্নত বিশ্বে এই মতবাদটি ব্রাত্য হয়ে পড়েছে। মার্কসবাদের উত্থান হবে এমন আশা নিয়ে লেখা আর্টিকলটিতে স্টুয়ার্ট জেফ্রিজ কী বলছেন দেখে নেওয়া যাক। আলোচনাটিতে বেশ কিছু সাধারণ মানুষ, বুদ্ধিজীবীর ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে। তাঁদের সবার বক্তব্য পর্যালোচনা করে নিম্নলিখিত সত্যটিই বেরিয়ে আসছে, যা কেবল ইউরোপের ক্ষেত্রে নয় সমগ্র বিশ্বের জন্যও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। But what's the point thinking about Guevara and Castro in this day and age ? Surely violent socialist revolution is irrelevant to workers' struggles today ? এই সময়ে দাঁড়িয়ে গুয়েভরা এবং কাস্ত্রোর কথা ভাবার কোনো যুক্তিই নেই। নিশ্চিত করে বলা যায় সশস্ত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আজকের শ্রমিক সংগ্রামে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক।

(চলবে)

# সংস্কৃত ভাষা-দিবস এবং সংস্কৃত-সপ্তাহ

**সমিত দে**

সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা তথা সনাতন ধর্ম-সংস্কৃতির বাঙ্ময়ী প্রকাশ মাধ্যম হলো সংস্কৃত ভাষা। কয়েক সহস্র বছর যাবৎ বেদ-উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-বিজ্ঞান গণিত এবং কাব্য নাট্যশাস্ত্র-সহ যে বিশাল রচনাসম্ভার সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, সমসাময়িক অন্য কোনো ভাষায় সেই ঋদ্ধতা নেই। তাই সংস্কৃতভাষা না জানলে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি-ধর্ম- দর্শনকে যথার্থভাবে জানা কখনই সম্ভব নয়। স্বামী বিবেকানন্দের কথায়— ''ভারতে 'সংস্কৃত ভাষা' ও 'মর্যাদা' সমার্থক।''

'আন্তর্জাতিক ভাষা-দিবস (২১ ফেব্রুয়ারি)' পালিত হবার বহু বছর পূর্বে ১৯৬৯ সালে ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রক শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিকে 'সংস্কৃত দিবস' হিসাবে নির্দিষ্ট করেন এবং ওই বছর থেকে সারা ভারতে 'সংস্কৃত দিবস' উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে ২০০১ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নেয়— শ্রাবণী পূর্ণিমার পূর্বের তিনদিন ও শ্রাবণী পূর্ণিমার পরবর্তী তিনদিন যুক্ত করে 'সংস্কৃত সপ্তাহ' পালন করা হবে। ওই নির্দিষ্ট সপ্তাহে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি স্তরে সারা ভারত জুড়ে সংস্কৃত ভাষার প্রচার-প্রসার তথা পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

এমন জিজ্ঞাসা মনে আসতেই পারে, কেন শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিকে 'সংস্কৃত দিবস' হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হলো? একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা নিজেরাই এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাব। সনাতন সংস্কৃতির একটি পরম্পরা হলো— যা কিছু মঙ্গলময়, যা কিছু কল্যাণকারী, যা কিছু মহৎ সবার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। তাই আমরা বলি বৃক্ষদেবতা, গোমাতা; তাই আমরা পালন করি গুরু পূর্ণিমা, রামনবমী, জন্মাষ্টমী। শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে প্রাচীন ভারতবর্ষে শিক্ষাবর্ষের সূচনা হতো। ঋষিকুল বিদ্যার্থীদের মধ্যে জ্ঞানের দীপ জ্বালিয়ে বেদ অধ্যয়নের সূচনা করতেন। সুললিত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল গভীর প্রজ্ঞাযুক্ত এই প্রাচীন ঋষিকুলের মাধ্যমেই। শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে সেই ঋষিকুলকে স্মরণ করার জন্য উৎসব করি। সেইজন্য ভারত সরকার শ্রাবণী-পূর্ণিমা তিথিকে 'সংস্কৃত-দিবস' হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

'সংস্কৃত-দিবস' তথা 'সংস্কৃত সপ্তাহ' সারাদেশ ব্যাপী পালন করার উদ্দেশ্য সংস্কৃত ভাষার পুনরুজ্জীবন। সরকারি স্তরে বিবিধ নীতি নেওয়া হলেও সেগুলি যথার্থভাবে বাস্তবে রূপায়ণ করতে গেলে সমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে উৎসাহের সঙ্গে। সংস্কৃত- দিবসে এবং সংস্কৃত সপ্তাহে সরকারি স্তরে বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে, গুরুকুলে সংস্কৃত ভাষা বিষয়ে আলোচনাচক্র, সংস্কৃত কাব্যপাঠ, সংস্কৃত ভাষার নাটক সংগীত ইত্যাদি বিষয়ে আয়োজন করা হয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা সারা ভারতে কীভাবে সংস্কৃত দিবস, সংস্কৃত সপ্তাহ উদ্‌যাপন হয়েছে তার সংবাদ পেতে পারি।

এখন যদি আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রশ্ন করি বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে অথবা একটি নির্দিষ্ট সপ্তাহ সংস্কৃত ভাষা বিষয়ে চর্চা করি তাহলেই কি সংস্কৃত ভাষার পুনরুজ্জীবন সম্ভব? না তা কখনই সম্ভব নয়। আসলে শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন আমাদের কাছে ব্রত উদ্‌যাপনের দিন— আমরা যেন আমাদের ভাষাজননী সংস্কৃত ভাষায় প্রচার-প্রসারে আন্তরিক প্রয়াস নিতে পারি। এই ভাষাতেই আমরা যেন ভারতবর্ষের সকল প্রান্তের মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারি। বিবেকানন্দের কথায়— ''এমন একটি মহান পবিত্র ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে, অন্য সমুদয় ভাষা যাহার সন্ততিস্বরূপ। সংস্কৃতই সেই ভাষা। ইহাই (ভাষা সমস্যার) একমাত্র সমাধান।''

একটি ভাষার পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে একটি ঘটনা বলি। ঘটনাটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও বিস্ময়কর। স্থানাভাবে ছোট্ট করেই বলছি। আজকের ইজরায়েলের রাষ্ট্রভাষা হিব্রু। কিন্তু কেমন করে হারিয়ে যাওয়া ভাষা আবার মানুষের মুখের ভাষা হলো? আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছরেরও বেশি আগে ইহুদিরা Soshua-র সঙ্গে ইজরায়েলে এসেছিলেন। সেই সময় থেকে ১৩৫ খ্রিস্টাব্দে Bar Kohba যুদ্ধ পর্যন্ত ইহুদিদের মাতৃভাষা ছিল হিব্রু। কিন্তু এই যুদ্ধের পর থেকে রাজ্যহীন হয়ে ইহুদিরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং হিব্রু ভাষাও মুখের ভাষা হিসাবে হারিয়ে গেল। এরপর প্রায় ১৭৫০ বছর পর Eliezer Ben-Yehuda এবং তাঁর বন্ধু ১৮১৮ সালের ১৩ অক্টোবর হিব্রু ভাষার পুনরুজ্জীবনের জন্য নিজেদের মধ্যে হিব্রুভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করেন। Ben-Yehuda-র পুত্র Ben-Zion Ben- Yehuda আধুনিক যুগে সম্পূর্ণ হিব্রুভাষী মানুষ। Ben-Yehuda আধুনিক যুগে প্রথম হিব্রু অভিধান তৈরি করেছিলেন। আজকের দিনে সমগ্র ইহুদি জাতি Beb-Yehuda-কে হিব্রু ভাষার 'পুনর্জাগরণকারী' হিসাবে মর্যাদা দিয়েছেন।


## বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ

**আবেদন**

গত কয়েক সপ্তাহের অবিরাম বর্ষণে কেরলের ভয়াবহ দুর্যোগে বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর এবং যথাসাধ্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে আবেদন জানানো হচ্ছে।

নগদে/চেকে/ড্রাফটে সাহায্য পাঠাবার বিবরণ :

**BASTUHARA SAHAYATA SAMITI**
**27/1B, Bidhan Sarani, Kolkata-700006**
**UCO Bank, Beadon Street**
**A/C No.–17390100003251**
**IFSC–UCBA0001739**
**অথবা**
**INDIAN OVERSEAS BANK**
**Sreemani Market Br.**
**A/C No.–103501000001235**
**IFSC–TOBA0001035**
**আমাদের PAN–AAATB7422R**

**এই সেবাকাজে দেয় দান আয়করের 80G (vi) ধারায় সুবিধাপ্রাপ্ত**
**আপনার/আপনাদের PAN ও পূর্ণ ঠিকানা জানাবেন**

# সংসদে বিল পাশ করিয়ে রামমন্দির নির্মাণের দাবি

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ নিয়ে আদালতে যদি কোনো সমাধান সূত্র না মেলে তাহলে সংসদে বিল পাশ করেই রামমন্দির নির্মাণের পথে এগোন উচিত বলে মন্তব্য করেছেন উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশবপ্রসাদ মৌর্য। তবে, এখনই যে সংসদে বিল পাশ করে রামমন্দির নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়— সে কথাও বলেছেন কেশবপ্রসাদ। অযোধ্যায় রামমন্দির সংক্রান্ত মামলাটি দীর্ঘদিন ধরেই ঝুলে রয়েছে। এরই ভিতর আইনজীবী এবং কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বল আদালতে আর্জি জানিয়েছিলেন--- ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে যেন রামমন্দির মামলায় কোনো রায় সুপ্রিম কোর্ট না দেয়। তবে বিচারপতিরা অবশ্য কপিল সিব্বলের এই আর্জিতে কর্ণপাত করেননি। আবার এটাও ঠিক— রামমন্দির সংক্রান্ত মামলার রায় সুপ্রিম কোর্ট এখনো পর্যন্ত দেয়নি। কবে দেবে— তা এখনো পরিষ্কার নয়। এদিকে সব পক্ষই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে রামমিন্দর মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কী রায় দেয় তা জানার জন্য। রামমন্দির মামলার রায় বেরতে এত দেরি হওয়ার বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়েই কেশবপ্রসাদ মৌর্য এই কথা বলেছেন।

কিন্তু উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী সংসদে বিল পাশ করিয়ে রামমন্দির নির্মাণের কথা বললেও, এই মুহূর্তে সংসদের দুই কক্ষে বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। লোকসভায় গরিষ্ঠতা থাকলেও রাজ্যসভায় বিজেপি এখনো গরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। ফলে, লোকসভায় বিল পাশ করালেও, রাজ্যসভাতে আটকে যাবে বিজেপি। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে কেশবপ্রসাদ বলেন, 'যদি সত্যিই দেখা যায় যে, সংসদে বিল আনা ছাড়া রামমন্দির নির্মাণ সম্ভব নয়, তখন সে বিল আনতে হবে সংসদের দুই কক্ষে আমাদের পর্যাপ্ত গরিষ্ঠতা হওয়ার পরই। তখন ও নিয়ে কালক্ষেপ করলে হবে না।'

কেশবপ্রসাদ মৌর্য একথা বলার কয়েকদিন আগে হায়দরাবাদে বিজেপি সভাপতি অমিত শাহও বলেছেন, ২০১৯-এর নির্বাচনের আগে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ হবে। বিজেপির অন্যান্য নেতাদের মুখেও রামমন্দিরের কথা শোনা যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে রামমন্দির আবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে দাঁড়াবে। এদিকে, রামমন্দির ইস্যুতে মুসলমান সংগঠনগুলির ভিতরও মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কোনো কোনো মুসলিম সংগঠন অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের পক্ষে মত দিয়েছে। অযোধ্যায় রামজন্মভূমি জমির অন্যতম সত্ত্বাধিকারী শিয়া ওয়াকফ বোর্ড জানিয়েছে, এই জমি তারা স্বেচ্ছায় রামমন্দির নির্মাণের জন্য দিয়ে দিতে চায়। অন্যদিকে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড-সহ অন্যান্য কয়েকটি মুসলমান সংগঠন রামমন্দির নির্মাণের প্রবল বিরোধিতা করছে। এইরকম পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট কী রায় দেয়— তার উপর নজর রাখছে সব পক্ষই।

## গোরু পাচারের প্রতিবাদ করায় তিন সাধু খুন

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** গোরু পাচারের প্রতিবাদ করায় তিনজন সাধুকে খুন করল দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের কুদারকোটের বিধুনায়। তিনজন সাধুই ভয়ানকনাথ মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পুলিশ সূত্রে প্রকাশ, তিনজনকেই খুন করা হয়েছে গলা কেটে। এই রীতিতে হত্যা করে মুসলমান জিহাদিরা। হত্যার উদ্দেশ্য প্রাথমিকভাবে ধরা না গেলেও পুলিশের সন্দেহ, গোরু পাচারের প্রতিবাদ করার কারণেই সম্ভবত এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। তিনজন সাধুর নাম লজ্জা রাম (৬৫), হালকে রাম (৫৩) এবং রামশরণ (৫৬)। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ জনতা পথ অবরোধে শামিল হয়। কোনও কোনও জায়গায় পাথর ছোঁড়ার এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটেছে বলে জানা গেছে। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ায় ক্ষয়ক্ষতি বেশি হয়নি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিধুনা অঞ্চলে মুসলমান গোপাচারকারীদের উপদ্রব আগের থেকে বেড়ে গেছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তারা যোগী আদিত্যনাথ সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

# হরিদ্বারে বিসর্জিত বাজপেয়ীর চিতাভস্ম

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রয়াণের তিনদিন পরে হরিদ্বারে বিসর্জন দেওয়া হলো তাঁর চিতাভস্ম। বাজপেয়ীর পালিতা কন্যা নমিতা ভট্টাচার্য এবং তাঁর স্বামী রঞ্জন ভট্টাচার্য হর কি পৌড়ির ঘাটে প্রয়াত নেতার চিতাভস্ম বিসর্জন

দেন। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ এবং অন্য নেতৃবৃন্দ। গত ১৯ আগস্ট হর কি পৌড়িতে স্বর্গীয় অটলবিহারী বাজপেয়ীর চিতাভস্ম বিসর্জন দেওয়া হয়।

ওইদিন সকালেই দিল্লি থেকে বিমানে হরিদ্বারে নিয়ে আসা হয় অটলবিহারীর চিতাভস্ম। বাজপেয়ীর পালিতা কন্যা নমিতা ভট্টাচার্য, জামাতা রঞ্জন ভট্টাচার্যর সঙ্গে একই বিমানে চিতাভস্ম নিয়ে আসেন রাজনাথ সিংহ, অমিত শাহ এবং যোগী আদিত্যনাথ। ওইদিন সকাল থেকেই সমগ্র হরিদ্বার শহর জুড়ে ছিল প্রয়াত নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মানুষের ঢল। হর কি পৌড়ির জলি গ্রান্ট বিমানবন্দরে জনতার ভিড় সামলাতে এবং ভি আই পিদের যাতায়াতের পথে নিরাপত্তা রক্ষা করতে এক হাজার পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল। ভাল্লা কলেজ চত্বর থেকে চিতাভস্ম নিয়ে যাত্রা শুরু হয়।

ভাল্লা কলেজ থেকে হর কি পৌড়ি পর্যন্ত রাস্তার দুধারে ছিল কাতারে কাতারে মানুষের ভিড়। হর কি পৌড়ির ঘাটে, রাস্তার দু'ধারে বাড়ির ছাদে, বারান্দায় সর্বত্র মানুষের ভিড়। জলি গ্রান্ট বিমানবন্দর থেকে বাজপেয়ীর চিতাভস্ম প্রথমে নিয়ে আসা হয় ভাল্লা কলেজে। সেখান থেকে যাত্রা শুরু হয়। ফুলে ঢাকা ট্রাকে চিতাভস্ম নিয়ে যাওয়া হয় হর কি পৌড়ির ঘাটে। রাস্তার দুধারে সমবেত জনতা ফুলবৃষ্টি করে। জনতার ভিতর থেকে আওয়াজ ওঠে— 'অটলজী অমর রহে,' 'যব তক সুরজ চাঁদ রহেগা, অটলজী কা নাম রহেগা' স্লোগান।

হর কি পৌড়ির ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটে তৈরি করা হয়েছিল বিশেষ মঞ্চ। সেখানে নানাবিধ শাস্ত্রীয় আচার পালনের পর চিতাভস্ম বিসর্জন দেওয়া হয় গঙ্গায়। হরিদ্বারের মতোই অটলবিহারী বাজপেয়ীর অস্থিকলস অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে বিজেপির পক্ষ থেকে। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান জানিয়েছেন, তাঁর রাজ্যে সব গ্রাম পঞ্চায়েতে নিয়ে যাওয়া হবে বাজপেয়ীর অস্থিকলস। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে মধ্যপ্রদেশে বিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যসূচিতে অটলবিহারী বাজপেয়ীর অবদানের কথা থাকবে। এছাড়াও অটলবিহারী বাজপেয়ীর নামে তিনটি পুরস্কারের কথাও ঘোষণা করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী।

উত্তরপ্রদেশেও সব নদীতে প্রয়াত নেতার অস্থি বিসর্জন দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, অটলবিহারী বাজপেয়ীর নামে চারটি স্মারক তৈরি করা হবে। একটি হবে বাজপেয়ীর পৈতৃক ভিটে আগরার বটেশ্বরে, বাকিগুলি কানপুর, লখনউ এবং বলরামপুরে।

# কেরলের দুর্গতদের সেবায় সবার আগে স্বয়ংসেবকরা

**নিজস্ব সংবাদদাতা ॥** লাগাতার দশদিন ধরে বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিতে ভাসছে ভারতের একেবারে দক্ষিণের রাজ্য কেরল। গত একশো বছরে এরকম বন্যার কবলে পড়েনি এই ছোট রাজ্যটি। ইতিমধ্যে ৬ লক্ষের বেশি মানুষের ঘরবাড়ি, সহায় সম্বল ভেসে গিয়েছে। চারশো মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি ১০ লক্ষ ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বন্যার ভয়াবহতা শুরু হতেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা বন্যাদুর্গতদের উদ্ধার কাজে নেমে পড়েন। নিজেরাই নৌকা সংগ্রহ করে, ভেলা বানিয়ে নিরাপদ স্থানে তাদের পৌঁছে দিতে শুরু করেন। জলের প্রবল স্রোতের মধ্যে প্রাণ হাতে করে ৫ হাজার স্বয়ংসেবক দিনরাত বন্যাদুর্গতদের সেবায় লেগে রয়েছেন।

স্বয়ংসেবকদের পক্ষ থেকে ৩৭০০ ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে, তাতে ৭ লক্ষ মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। উদ্ধারকারী স্বয়ংসেবকদের মধ্যে ৩ জনের বন্যার তোড়ে ভেসে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে। কেন্দ্র সরকার, বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের পাঠানো ত্রাণসামগ্রী যেমন খাবারের প্যাকেট, জলের বোতল, চাল, ডাল, কাপড়, ওষুধ, তাঁবু প্রভৃতি অতি তৎপরতার সঙ্গে স্বয়ংসেবকরা ত্রাণশিবিরে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে চলেছেন। সেই সঙ্গে জল-স্থল ও আকাশবাহিনীর যে কয়েক হাজার জওয়ান বন্যাদুর্গতদের উদ্ধার কাজে ও ত্রাণ পাঠানোর কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন তাদেরও দেখভাল ও খাবারের ব্যবস্থা করছেন স্বয়ংসেবকরা। দুর্গম এলাকায় সরকারি কর্মচারী, সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীকে সবরকমের সহযোগিতা করছেন তাঁরা। তিরুবনন্তপুরমের বিশিষ্ট থেকে সাধারণ মানুষ সবারই এক কথা— বন্যা শুরু হতেই স্বয়ংসেবকরা সবার আগে উদ্ধার কাজে নেমে পড়েছেন। তাঁদের কথায়, যারা সঙ্ঘকে দিনরাত গালি দেয় তাদের এই ভয়াবহ সময়ে দেখা যাচ্ছে না। এসময় স্বয়ংসেবক ও সেনাবাহিনীই একমাত্র ভরসা।

# মুশারফ আমলের বারোজন ইমরান মন্ত্রীসভায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** গত ১৮ আগস্ট প্রত্যাশা মতোই বাইশতম পাক-প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন ইমরান খান এবং গোটা বিশ্ব দেখলো নির্বাচনের মাধ্যমে কীভাবে পাক-প্রশাসনের দখল নিল সেদেশের সেনাবাহিনী। ইমরানের মন্ত্রীসভায় ঠাঁই হয়েছে এমন বারোজনের, যারা পাক সেনানায়ক পারভেজ মুশারফের আমলে মন্ত্রী ছিলেন। পাকিস্তানের শাসক দল তেহরিক-ই-ইনসাফের মুখপাত্র ফাওয়াদ চৌধুরী ওইদিন ইমরানের মন্ত্রীসভার একুশ সদস্যের নাম ঘোষণা করেন টুইটারে, এর মধ্যে পাঁচজন ইমরানের পরামর্শদাতা, বাকি ১৬ জনের মধ্যে ১২ জনই মুশারফের আমলে মন্ত্রী ছিলেন বলে পাক সংবাদপত্র দ্য নিউজ জানাচ্ছে। মুশারফের সময়ে মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব সামলানো ফারুক নাসিক, তারিক বশির চিমা, গুলাম সরওয়ার খান, জুবাইদা জালাল, ফাওয়াদ চৌধুরী, শেখ রশিদ আহমেদ, খালিদ মকবুল সিদ্দিকি, সাফখাত মেহমুদ, মাখদুম খুশরু বখতিয়ার, আবদুল রাজ্জাক দাউদ, ড. ইশরাত হুসেন ও আমিন ইসলাম এবারও মন্ত্রীর ভূমিকায়। কূটনীতিকরা বরাবরই বলে আসছেন যে পাক রাজনীতিতে ইমরান হলেন সেনাবাহিনীর হাতের পুতুল। পারভেজ মুশারফের মতো সেনা-অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সেদেশের রাষ্ট্রযন্ত্র দখলের হ্যাঙ্গাম অতীত থেকে শিক্ষা নিয়েছে সেনা। বিশেষ করে বিশ্ব-দরবারে এনিয়ে পাঁচ কথা শুনতে হয়, মুখ আর মুখোশে পার্থক্য থাকে না। তাই সুকৌশলে সেদেশের তথাকথিত 'গণতান্ত্রিক' পদ্ধতির মাধ্যমে পাক-প্রশাসনের দখল নিতে চেয়েছিল 'সেনা', আর একাজে ইমরান খানকে দাবার বোড়ে হিসেবে ব্যবহার করেছিল তারা। কূটনীতিকরা বলছেন, সেই পরিকল্পনা যে খেটে গিয়েছে তা বোঝা যায় ইমরানের মন্ত্রীসভা দেখলে। যেখানে সেনা-সরকারের আমলের ১২ জনই পুনরায় মন্ত্রীপদে বহাল হয়েছেন।

বর্তমানে শাসক তেহরিক-ই-ইনসাফের সহসভাপতি শাহ মহম্মদ কুরেশি ইমরান মন্ত্রিসভায় বিদেশমন্ত্রকের পদ পেয়েছেন। সেই কুরেশি যিনি পাকিস্তান পিপলস পার্টির আমলে ২০০৮ সাল থেকে ২০১১ পর্যন্ত বিদেশমন্ত্রীই ছিলেন এবং তার সময়েই ২০০৮-এ মুম্বাইয়ে পাক-মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী হামলা সংঘটিত হয়। পাকিস্তানের লস্কর-ই-তৈবার হানাদাররা যেদিন মুম্বাইয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিলেন সেদিন নয়াদিল্লিতে 'কূটনৈতিক দৌত্য' করছিলেন কুরেশি। পারভেজ খাট্টাককে করা হয়েছে প্রতিরক্ষামন্ত্রী। ২০১৩ থেকে এবছর পর্যন্ত পাকিস্তানের খাইবার -পাখতুনখাওয়া প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সেনার মদতে ও পরামর্শে সেখানে মানবাধিকার বিরোধী একাধিক কাজকর্মের নজির রয়েছে নয়া প্রতিরক্ষামন্ত্রীর। আসাদ উমর হয়েছেন অর্থমন্ত্রী। তাঁর পারিবারিক গরিমা আরও মারাত্মক। তাঁর বাবা পাক সেনা-অফিসার লেফট্যানেন্ট জেনারেল মহম্মদ উমর ১৯৭১-এ খান-সেনার হয়ে বাংলাদেশের জনগণের ওপর নৃশংস অমানবিক অত্যাচারে অংশ নিয়েছিলেন।

# পরলোকে শক্তিশেখর দাস

আমাদের সকলের প্রিয় শক্তিশেখর দাস (শক্তিদা) গত ১৭ আগস্ট দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। রেখে গেছেন স্ত্রী ও ১ কন্যাকে। তিনি মধ্যকলকাতার মেডিকেল কলেজ শাখার স্বয়ংসেবক ছিলেন। বিজয়া ব্যাঙ্কে চাকরি করতেন। তাঁরা ৩ ভাই ও ১ বোন। ৬০-এর দশকে স্বয়ংসেবক হওয়া থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সঙ্ঘকাজে কখনো বিরাম নেননি। ১৪ আগস্ট দুপুর ১২.৩০ মিনিটে হাসপাতালে ভর্তি করানোর আগে সঙ্ঘকাজে মেতে ছিলেন। তিনি ভালো অভিনয় ও আবৃত্তি করতে পারতেন। স্বস্তিকা পত্রিকার প্রাণপুরুষ ভবেন্দু ভট্টাচার্যের নাটকে শক্তিদাই নায়ক হতেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কলকাতা মহানগরের সম্পর্ক প্রমুখ ও প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য ছিলেন। শক্তিদা ব্যবহারকুশল, পরিশ্রমী, ত্যাগী ও সন্দেহাতীত ভাবে সংগঠক ছিলেন। শক্তিদাকে অকস্মাৎ হারিয়ে স্বয়ংসেবকরা শোকবিহ্বল হয়ে পড়ে। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁর মরদেহে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য স্বয়ংসেবকদের ঢল নামে।

## শোকসংবাদ

গত ২৯ জুলাই ফুলরেণু আচার্য কলকাতায় নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বৎসর। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্টার সৌমেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য-এর তিনি সহধর্মিণী এবং বাসুদেব আচার্যের মাতৃদেবী। নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্যের ভ্রাতৃবধূ।

* * *

মালদহ নগরের স্বয়ংসেবক প্রসূন সেনের মাতৃদেবী ছায়া সেন গত ৪ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি স্বামী, ২ পুত্র রেখে গেছেন।

* * *

মালদহ নগরের ২নং গভঃ কলোনির স্বয়ংসেবক তথা দীর্ঘদিনের স্বস্তিকার পাঠক সত্যরঞ্জন দে গত ৫ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তিনি স্ত্রী, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

উত্তর মালদা জেলার ভিঙ্গোল শাখার স্বয়ংসেবক গৌরাঙ্গ রায় ১০ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর। তিনি বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরের পূর্বতন কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, চাঁচলের বামনপাড়ায় তাঁর বাসভবনে এক সময় সঙ্ঘ কার্যালয় ছিল।

* * *

উত্তর মালদা জেলার চাঁচল নগরের সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী হরিসাধন চক্রবর্তী গত ১৩ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৫ পুত্র, ২ কন্যা এবং নাতি- নাতনি রেখে গেলেন। এ অঞ্চলে বিশিষ্ট পুরোহিত হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল।

* * *

মালদহ নগরের স্বয়ংসেবক ভূপেশ চন্দ্র বর্মন এবং দশরথ বর্মনের মাতৃদেবী পুতুল

বর্মন গত ১০ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য ভূপেশ বর্মন প্রচারক হিসাবে কলকাতায় কাজ করেছেন।

# সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

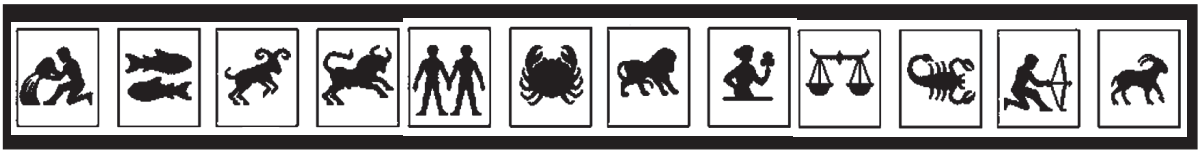

**২৭ আগস্ট (সোমবার) থেকে ২ সেপ্টেম্বর (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে কর্কটে বুধ-রাহু। সিংহে রবি, কন্যায় শুক্র, তুলায় বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী, শনি, মকরে মঙ্গল-কেতু। রবিবার ভোর ৩-২০ মিনিটে শুক্রের তুলায় প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র কুম্ভে শতভিষা থেকে বৃষে কৃত্তিকা নক্ষত্রে।**

**মেষ :** শরীরের যত্ন নিন ও উত্তেজক কথাবার্তা পরিহার করুন। বিদ্যা-বুদ্ধি, শাণিত কথাবার্তা ও জ্ঞানের উজ্জ্বল প্রকাশ। শিল্পী, কলাকুশলীর শ্রী-সৌন্দর্য ও সৃষ্টিশীলতায় কাঙ্ক্ষিত ফল। সন্তানের কর্মলাভের সম্ভাবনা। নিকট প্রতিবেশী ও ভ্রাতৃস্থান হিতকারী। দৃষ্টিশক্তি ও অস্থি চিকিসায় উদ্বেগ ও ব্যয়াধিক্য যোগ।

**বৃষ :** এ সপ্তাহে ব্যবসায়িক পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ আনন্দের কারণ। মানসিক ও মানবিকতার পূজারি। গুণীজনের সান্নিধ্য, গুরুজন বিষয়ে উদ্বেগ অবসান। কর্মে সিদ্ধিলাভ ও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক। যুবক-যুবতীদের নতুন যোগাযোগ। যুবক বন্ধু হিতকারী।

**মিথুন :** বিদ্যা-পাণ্ডিত্য ও সৃজনশীলতায় মান্যতা ও শংসাপ্রাপ্তি। নিজ উপস্থিতি ও বুদ্ধিমত্তায় বৈষয়িক সমস্যার সমাধান। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তি, লাইফ পার্টনারের নিজ উদ্যোগে কর্মপ্রাপ্তি। উচ্চ শিক্ষার্থে প্রবাস। সপ্তাহের প্রান্তভাগে রমণীর কারণে সময়ের অপচয় ও চঞ্চলতা।

**কর্কট :** চিন্তা-ভাবনায় দোদুল্যমানতা, ভালো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। মাতৃস্থানীয়ের শরীরের যত্নের প্রয়োজন। প্রতিযোগী ও ইন্টারভিউয়ে কার্যকরী বুদ্ধি ও সাফল্য। পিতার পরাজয়, চলার পথে নতুন দিশা। আয়-ব্যয়ের সমতা না থাকার সম্ভাবনা।

**সিংহ :** প্রবাসী পরিজনের প্রত্যাগমন। একাধিক উপায়ে আয়ের সূত্র সন্ধান। বাড়ি-গাড়ির শুভ যোগ। প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখুন। সন্তানের উচ্চশিক্ষা ও পরিবারের সদস্য বৃদ্ধির যোগ।

**কন্যা :** কর্মে নব উদ্যোগ। জ্ঞানার্জনে নতুন দিশা। অপ্রিয়জন ও বকধার্মিক থেকে সতর্ক থাকুন। কর্মের ক্ষেত্রে নতুন মিত্র লাভ। কর্মক্ষেত্রে আধিপত্য বজায় থাকবে। নতুন সুযোগের সম্ভাবনা। রুচিসম্মত সুখাদ্য, বিলাসী পোশাকে প্রবণতা বৃদ্ধি। শিক্ষক, অধ্যাপক, মঠাধীশ, গবেষক, শাস্ত্রীয় পণ্ডিতের প্রতিভার স্বীকৃতি ও সম্ভ্রম।

**তুলা :** কলহ, বিবাদ, অস্থিরতা, অতৃপ্তি, চপলতা, উদাসীনতায় ভরা মন। চাকুরেদের আর্থিক দিক থেকে লাভবানের সুযোগ বর্তমান। রমণীর মোহে হতাশা ও ব্যথিত বোধ। সপ্তাহের প্রান্তভাগে হতাশার সৈকতভূমি বর্ণময় বারিধারায় প্লাবিত হবে। গুরুজনের আশীর্বাদ ও তীর্থভ্রমণ।

**বৃশ্চিক :** পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, মাতার স্বাস্থ্য, কীটপতঙ্গ ও সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে সাবধানতা প্রয়োজন। শাণিত কথাবার্তায় প্রতিবেশীর উপর প্রভাব বৃদ্ধি। সাংসারিক দায়িত্ব পালনে শ্রম ও ব্যয় বৃদ্ধি। সমালোচনা, বিরূপ মন্তব্য, পরাক্রান্ত হৃদয়ে স্থান পরিবর্তন যোগ। শৌখিন ব্যবসায় বিনিয়োগ ও প্রাপ্তি শুভ।

**ধনু :** বিনয়, নম্রতা, সরলতা, সততা, সংবেদনশীলতা, সুন্দর শাস্ত্রীয় বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও অভিজাত্য গৌরব। কর্মদক্ষতার বহুমুখী প্রকাশ ও বিকাশ। প্রেমে পূর্ণতার প্রলেপ। গুরুজনে ভক্তি-শ্রদ্ধা, গৃহে পরিজন সমাবেশে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।

**মকর :** আয়ের শ্লথ গতি, কর্মক্ষেত্রে মানসিক অবসাদ, ক্লান্তি, স্বেচ্ছাবসর নয়তো কর্মচ্ছেদের সম্ভাবনা। শান্ত, সংযত ভাবে গৃহসুখ বজায় রাখুন। পুরানো মিত্র ও প্রতিবেশীর সান্নিধ্যে মানসিক প্রশান্তি। সন্তানের কর্মদক্ষতায় সরকারি স্বীকৃতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়, স্ত্রী অর্থ ও ভাগ্যোন্নতির সহায়ক।

**কুম্ভ :** শিল্পী, কলাকুশলীদের কর্মদক্ষতার বহুমুখী প্রকাশ, যশ ও খ্যাতি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠা। পারিবারিক সমস্যার অবসানে আনন্দঘন পরিবেশ। বুদ্ধির বাস্তব প্রয়োগে সন্তানের অপরাগ বা ব্যর্থতা যোগ। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগে প্রাপ্তিযোগ, ইতিবাচক, লাইফ, পার্টনারের সুপরামর্শ ও কর্মস্থানে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি, আর্থিক শুভ।

**মীন :** আয়ের একাধিক ধারার উন্মোচন। জ্ঞান-পাণ্ডিত্য ও স্বীয় দক্ষতায় প্রতিষ্ঠা, বাড়ি-গাড়ি, বিলাসিতায় সম্পৃক্ত মন। সঞ্চয়ের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, কবি-সাহিত্যিক ইলেকট্রনিক্স, সংবাদ মিডিয়ার দক্ষতা ও ধর্মার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি। রমণীর কুটিলতায় সম্মানহানির সম্ভাবনা।

● *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

—শ্রী আচার্য্য